নবীন শাস্ত্রী

সুবোধ ঘোষ

নবভারতী

প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর-১৯৬১

প্রকাশক

সুনীল দাশগুপ্ত

নবভারতী

৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট্

মুদ্রণ

রতিকান্ত ঘোষ

১৭।১, বিন্দু পালিত লেন

কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ

সুধীর মৈত্র

দাম আড়াই টাকা

দেখে মনে হবে, রায়মানিকপুরের সুরজিৎ রায় আজ যেন সপরিবারে সন্ন্যাস গ্রহণ করছেন।

প্রাসাদের মত নয়, সত্যিই বাড়িটা কোনকালে প্রাসাদই ছিল। সে প্রাসাদ বিপুল বৈভবের যত সম্ভারে পরিপূর্ণও ছিল। আজ আর সেই বৈভব অবশ্য নেই। কিন্তু নেই নেই করেও অনেক কিছু আছে। প্রাসাদের কার্নিশের সেই রঙীন পালেস্তারা ফিকে হয়ে গেলেও ঝরে পড়ে যায়নি। থামের গায়ে বেলোয়ারী দেয়ালগিরি আর ঘরে ঘরে ধুলোমাখা ঝাড়লণ্ঠন এখনও ঝুলছে।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল, রায়মানিকপুরের জমিদারবাড়ির যত আসবাব নীলামে বিক্রি করা হবে। বিজ্ঞাপনে নীলামের তারিখটাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সাতদিন ধরে বেশ একটু বিমর্ষ হয়ে চিন্তা করেছিলেন সুরজিৎ রায়। ভরসা করতে পারেন নি, সত্যিই রায়মানিকপুরের পুরনো রাজবাড়ির যত সেকেলে আসবাব কিনে নিতে ক্রেতার দল কলকাতা থেকে এত দূরে এসে ভিড় করবে। কিন্তু আজ দুপুরে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়িয়ে যে দৃশ্য দেখেছেন, তাতে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন। বহু লোকের ভীড় জমেছে। গোটা দশ মোটরগাড়িও দাঁড়িয়ে আছে। কলকাতা, বর্ধমান আর আসানসোল থেকে নানা জাতের আর নানা পোশাকের মানুষ এসে ভিড় করেছে। বাঙালী মাড়োয়ারী আর পাঞ্জাবী; দু'জন ইওরোপিয়ানও আছেন; তার মধ্যে একজন মহিলা। ইওরোপিয়ান মহিলা একটি চেক-বই হাতে নিয়েই দাঁড়িয়ে আছেন।

গত রাত্রিতেও সুরজিৎ রায় ভাল করে ঘুমোতে পারেননি, কারণ বিশ্বাসই করতে পারেননি যে, রায়মানিকপুরের পুরনো রাজবাড়ি

জয়বিলাসের যত ধুলোমাখা সেকেলে আসবাব কেনবার জন্য কোন আধুনিক শৌখীনের মনে কোন আগ্রহ চঞ্চল হয়ে উঠবে। হতাশ হয়ে আর অসহায়ভাবে ছটফট করেছিলেন সুরজিৎ রায়। বার বার ডাক দিয়ে স্ত্রী প্রভাময়ীর ঘুম ভাঙিয়ে ছিলেন—প্রভা। প্রভা।

—কি?

—হল না। হবে না। কেউ আসবে বলে মনে হচ্ছে না। কোন ভরসা নেই।

—আসবে। তুমি এখন ঘুমোও।

মৃদুস্বরে আর উদাসভাবে একটা সান্ত্বনার কথা বলে প্রভাময়ী আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

মাঝরাতে আর একবার প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলেন সুরজিৎ রায়। আর, প্রভাময়ীও চমকে উঠে ঘুম-ভাঙা চোখ টান করে দেখেছিলেন, আলো জ্বেলে আর সেই আলোর কাছে একটা চেয়ারের উপর একটা বই হাতে নিয়ে বসে আছেন সুরজিৎ রায়। ধবধবে সাদা চুলে ভরা মাথাটাকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে যেন হাসতে চেষ্টা করছেন সুরজিৎ রায়। কুঞ্চিত কপালের রেখার উপর ঘামের বিন্দু চিকচিক করছে। সাদা ভুরুদুটোও যেন শিথিল হয়ে কাঁপছে। চোখের দৃষ্টিটা কিন্তু বড় তীব্র।

প্রভাময়ী ক্ষুব্ধভাবে বলেন—তুমি এরকম করছ কেন? এত ভাবনা করবার কি আছে?

সুরজিৎ রায় হাসেন—না, ভাবনা করবার কিছু নেই। ভাবছি... এই বইটাতে লেখা একটা অদ্ভুত কথা পড়ে ভাবছি, জনক রাজা খুব চালাক মানুষ ছিলেন।

প্রভাময়ীও এইবার হেসে ফেলেন—তার মানে?

—মিথিলায়াং প্রদগ্ধায়াং ন মে নশ্যতি কিঞ্চন। মিথিলা পুড়ে গেলেও আমার কিছুই নষ্ট হবে না।

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ান প্রভাময়ী। ধীরে ধীরে হেঁটে ঘরের কোণের টেবিলটার দিকে এগিয়ে যান। একটা হাতপাখা তুলে নিয়ে

বৃদ্ধ সুরজিৎ রায়ের সেই রাতজাগা করুণ চেহারার পাশে এসে দাঁড়ান। আঁচল দিয়ে সুরজিৎ রায়ের কপালের ঘাম মুছে দিয়ে হাত-পাখার বাতাস দিতে থাকেন প্রভাময়ী।

হঠাৎ মুখ তুলে, আর চোখের দৃষ্টিটাকে একেবারে সুস্থির করে প্রভাময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন সুরজিৎ রায়। না, ঠিক মুখের দিকে নয় বোধহয়। সুরজিৎ রায় দেখছেন, প্রভাময়ীর মাথার এত বড় খোঁপাটা ভেঙে গিয়ে চুলের গোছা সারা পিঠের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। সুরজিৎ রায় বোধহয় অপলক চোখ তুলে তাঁর জীবনের চল্লিশ বছরের সঙ্গিনীর সেই এলানো চুলের মধ্যে একটা করুণ বিদ্রূপের ভ্রূকুটি লক্ষ্য করছিলেন। প্রভাময়ীর মাথার সাদা-কালো চুলের গোছাটা ঘাড়ের কাছে এক টুকরো কালো ফালি দিয়ে আলগা করে বাঁধা। বোধহয় হঠাৎ মনে পড়েছে সুরজিৎ রায়ের, ত্রিশ বছর আগেও সাচ্চা মোতির ঝালর দিয়ে প্রভাময়ী তার এই ঘাড়ের কাছে খোঁপার বাঁধন এঁটে দিত।

অনেকক্ষণ পরে কথা বলেন সুরজিৎ রায়।—আমার ধারণা ছিল, নীলামে যতই কম দর উঠুক না কেন, সব বেচে দিলে অন্তত হাজার দশ টাকা হবে।

প্রভাময়ী—আমার তো মনে হয়, তা হবে।

সুরজিৎ রায়—কিন্তু কেউ যদি না আসে, যদি নীলামও সম্ভব না হয়, তবে কি করে হবে?

প্রভাময়ী—তুমি এত হতাশ হয়ে পড়ছ কেন? দেখই না কেন, কি হয়?

আজ দেখতে পেয়েছেন সুরজিৎ রায়; তাঁর সন্দেহটাই ভুল হয়েছে। জয়বিলাসের যত আসবাব আর সেকেলে শৌখীনতার যত উপকরণ কিনে নেবার জন্য সত্যই যে ব্যাকুল ক্রেতার দল হাজির হয়েছে। নীলামে দর ভালং চড়বে বলে মনে হয়। মোট হাজার দশ কেন, হাজার পনর-বিশও হয়তো পাওয়া যাবে।

পায়ে বিবর্ণ হরিণ চামড়ার একজোড়া চটি, গায়ে তসরের ঢিলে পাঞ্জাবী, আর পরনে তসরের একটা ধুতি, যার কোঁচার ভাঁজে তিনটে ছেঁড়া লুকিয়ে আছে। রায়মানিকপুরের পুরনো রাজবাড়ি জয়বিলাসের স্বামী, সত্তর বছর বয়সের শ্রীসুরজিৎ রায় হাসিমুখে আগন্তুকদের উদ্দেশে হাত তুলে নমস্কার জানান। কিন্তু সেই মুহূর্তে হাতদুটো যেন যন্ত্রণাক্ত হয়ে কেঁপে ওঠে। সাদা চুলে ভরা মাথাটাও কেঁপে ওঠে। আর কিছুক্ষণের জন্য যেন স্মৃতিহারা মানুষের চোখের মত একজোড়া উদাস চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকেন। পুরনো জয়বিলাসের চওড়া বারান্দায় সিঁড়ির একটা ধাপের উপর যেন একটা পাথুরে মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন সুরজিৎ রায়।

ক্রেতার দলের মুখে মুখে একটা উৎসাহের গুঞ্জন জেগে ওঠে। সকলেই বেশ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। রাজবাড়ির ভিতরের ও বাইরের চারদিকে ঘুরে ওরা একবার দেখে নিতে চায়, কেমন আসবাব, কি-ধরনের আসবাব আর সামগ্রী বেচে দিতে চাইছেন সুরজিৎ রায়। সত্যিই কি বিজ্ঞাপনে যা বলা হয়েছিল, নানা-রকম ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে। শাজাহানের আমলের তৈরি শ্বেতপাথরের একটা চৌকি, সুলেমানী পাথরের আঙুর-লতা দিয়ে কাজ করা আর চারটে পায়াতে মীনা-করা বরফি, সত্যিই আছে কি ? চারটে তরবারিও নাকি আছে, হাতলগুলিতে সোনার ফুলকারি। বর্গির হামলার সময়ে সুরজিৎ রায়ের পূর্বপুরুষ সেই দুঃসাহসী পরগণাইত সংসারচন্দ্র রায় তাঁর বাগ্দি পাইক-দল নিয়ে বর্গিকে বাধা দিয়েছিলেন। নবাব আলিবর্দি তাই খুশি হয়ে সংসারচন্দ্রকে নাকি এই চারটি তরবারি উপহার দিয়েছিলেন। রাজপুত চিত্রকলার অনেকগুলি বেশ ভাল-ভাল নমুনাও নাকি আছে। বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল, এই সব ছবির মধ্যে পাঁচটা ছবি ছিল মিউটিনির নেতা বাবু কুমার সিংহের সম্পদ। প্রায় একশো বছর ধরে ছবিগুলি এ-হাত আর সে-হাত হয়ে একদিন সুরজিৎ রায়ের পিতামহ মহাবীর রায়ের হাতে এসে পৌঁছেছিল।

দশটা প্রকাণ্ড আকারের মেহগনির পালঙ্ক, রুপোর পাতে মোড়া গোটা দশ আসাসোটা, আর তামার একটা চার হাত উঁচু আমগাছ, যেটা আসলে হলো একটা পিলসুজ : এই সবও আছে। জয়বিলাসের হলঘরের ভিতরে সবই টেনে নিয়ে এসে জড়ো করা হয়েছে। হাতির দাঁতের চৌখুপী দিয়ে অদ্ভুতভাবে গড়া একটা টেবিলও আছে। এটা নাকি এদেশী সামগ্রী নয়। সুরজিৎ রায়ের পিতামহ মহাবীর রায়ই এটা বর্মার এক ফুঙ্গির কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলেন। টেবিলের গায়ে বর্মী লিপিতে লেখা একটা কবিতা থেকে জানতে পারা যায়, টেবিলটার বয়স দুশো বছরের কম নয়।

নীলাম করবার মত আরও জিনিস আছে। ক্রেতার দল এত ব্যস্ত হয়ে তাঁদের হাতে-ধরা প্যামফ্লেট পড়ছেন, তারই মধ্যে তালিকাটা আছে। প্রতি বছর বিষুব সংক্রান্তির দিনে জয়মঙ্গলার ভোগের সময় যে তোপটা গত একশো বছর ধরে বারুদের গোলা ফাটিয়ে সময় ঘোষণা করেছে, সেই তোপটাও বিক্রী করা হবে। আস্তাবলের ভিতরে এখনো ধুঁকে ধুঁকে বিচালী খাচ্ছে যে বুড়ো আরবী ঘোড়াটা, যার নাম রোশনলাল, সেও আজ বিক্রী হবে। তা ছাড়া, চারটে সেগুনের আলমারি, একগাদা বিদরি বাসন, আর গোটা দশেক গালিচা আছে। এর মধ্যে একটা গালিচাকে সুরজিৎ রায় নিজেই অর্ডার দিয়ে কাশ্মীর থেকে তৈরি করিয়ে এনেছিলেন। নক্সা আর ডিজাইন তিনি নিজেই এঁকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ জয়বিলাসেরই চেহারাটা। সামনে দেবদারুর একটা কুঞ্জ, জয়বিলাসের মাথার উপর পূর্ণিমার চাঁদ ভাসছে। আর, একটি দেবদারুর কাছে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে এক পুরুষ ও এক নারী। সুরজিৎ রায় জানেন, আর প্রভাময়ীও জানেন, ঐ পুরুষ আর নারী তাঁদের নিজেদেরই দুই মূর্তির কল্পিত প্রতীক। আজও নিশ্চয় ভুলে যাননি সুরজিৎ রায়, আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে এই গালিচারই উপর ফুল ছড়িয়ে সুরজিৎ আর প্রভাময়ীর

জীবনের ফুলবাসর উদ্‌যাপিত হয়েছিল। সুরজিৎ রায়ের বয়স তখন ত্রিশ, প্রভাময়ীর কুড়ি।

আরও আছে। অনেকগুলি পুঁথি; সংস্কৃত ভাষা আর প্রাকৃত ভাষায় লেখা পুঁথি। একটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থও আছে, হাফেজের গুলিস্তানের একটি নকল। এক গাদা মুদ্রা-সংগ্রহও আছে। বেশির ভাগই গুপ্তযুগের মুদ্রা। মধ্যভারতের গ্রীকরাজা হেলিয়োডোরাসের একটি মুদ্রা আর চারটে আকবরী আশরফী। সুন্দর কারুকার্যের নিদর্শন, একটা কষ্টিপাথরের ঝাঁপিও আছে, যার ভেতরে প্রাচীন সঞ্চয়ের অবশিষ্ট জহরতের কিছু কুচো-কাচা পড়ে আছে—কয়েকটা পোখরাজের খণ্ড, ছোট ছোট গোটাকয়েক পান্না আর ফিরোজা।

তাঞ্জোরী নটরাজের তিনটে ব্রঞ্জ, মার্বেলের একটা কিউপিড, চন্দনকাঠের বারকোশ দুটো, একমণ পেতলের প্রকাণ্ড একটা ঘণ্টা আর মখমলের একটা শামিয়ানা, যার ঝালরগুলো হলো কিংখাবের ফুলঝুরি।

ক্রেতার ভিড় দেখে সুরজিৎ রায়ের চোখের চাহনি ঝিক করে হেসে উঠল ঠিকই, কিন্তু পর মুহূর্তেই যেন ঝাপসা হয়ে গেল সুরজিৎ রায়ের সেই দুই উৎফুল্লতার চোখ। সুরজিৎ রায়ের সত্তর বছর বয়সের প্রাণ যেন একটা বধ্যভূমির মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্রেতাদের ব্যস্ততা যেন একদল জহ্লাদের ব্যস্ততা। ইওরোপিয়ান মহিলার হাতের চেক-বই যেন একটা শাণিত ছুরি। পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের দৃষ্টিটা যেন একটা হিংস্র লোভের রসনা। পুরনো জয়বিলাসের দুর্বল রক্তমাংসের সব স্বাদ চেটে-পুটে লুঠ করে নিয়ে যাবার জন্য একদল ক্ষমাহীন ক্ষুধার্ত এসে ভিড় করেছে।

একটা ঝড়ের বাতাস দেবদারুর মাথা কাঁপিয়ে দিয়ে ছটফট করে ওঠে। আস্তাবলের বিচালির কুটো এলোমেলো হয়ে উড়তে থাকে। বুড়ো রোশনলালও যেন দুঃসহ অস্বস্তির জ্বালায় পা ছুঁড়ে ছটফটিয়ে ওঠে। আর সুরজিৎ রায়ের অসহায় মূর্তিটা আরও করুণ হয়ে যায়।

গরদের ধুতির কোঁচাটাও ফুরফুর করে উড়ে ভিতরের তিনটে লুকনো ছোঁড়াকে যেন মেলে দিয়ে দোলাতে থাকে। ক্রেতাদের মধ্যে সাহেবী সাজের এক বাঙালী ভদ্রলোক সত্যিই হেসে ফেলেন।

কিন্তু তরুণ বয়সের এক বাঙালী ভদ্রলোকের চোখের দৃষ্টিটা যেন একটু বিষণ্ণ হয়ে যায়। ভদ্রলোক যেন একটু ভয় পেয়েছেন।

এই ভদ্রলোককে কিন্তু ক্রেতা বলে মনে হয় না। বয়স অল্প। ত্রিশ বছরও হবে কিনা সন্দেহ। সাজ-পোশাকেও বড়মানুষী অবস্থার কোন ছাপ নেই। আধময়লা একটা টুইলের কামিজ আর ধুতি পরেছেন ভদ্রলোক। হাতে একটা সাধারণ রঙীন কাপড়ের ঝোলা। চশমার ফ্রেমটাও বেশ পুরনো, বেশ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। পুরনো রাজবাড়ি জয়বিলাসের ঐশ্বর্য তেমন মূল্যবান না হলেও এই ভদ্রলোককে দেখে মনে হয় না যে, সে ঐশ্বর্যের ছিটেফোঁটা কেনবারও কোন সামর্থ্য ভদ্রলোকের আছে। তবে কি শুধু নীলামের মজা দেখতে এসেছে এই ছোকরা? মজা দেখবার আশা নিয়ে এসে থাকলে ওভাবে চোখ দুটো এত করুণ করে তাকিয়ে থাকে কেন?

সুরজিৎ রায় ভাঙা-গলায় ডাক দেন—আসুন আপনারা সবাই, এই হলঘরের ভেতরে আসুন। যা যা আছে, সব জিনিস আগে একবার ভাল করে দেখুন, আসুন,···আইয়ে সর্দারজী ; ম্যাডাম, প্লীজ কম্ ইন।

সকলেই ব্যস্তভাবে সেই হলঘরের ভেতরে ঢুকে দেখতে থাকেন, যেখানে ভাঙা মিউজিয়মের মত ছন্নছাড়া রূপ নিয়ে পুরনো জয়বিলাসের যত মূল্যবান সামগ্রী ছড়িয়ে পড়ে আছে। তরুণ বয়সের ভদ্রলোকও আস্তে আস্তে ঘুরে ফিরে দেখতে থাকেন। তারপরেই যেন পরিশ্রান্তের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন।

কিছুক্ষণ পর, ভদ্রলোক আবার আস্তে আস্তে হেঁটে সুরজিৎ রায়ের কাছেই এসে দাঁড়ান। সুরজিৎ রায় বলেন—আপনি কি কিছু বলতে চান?

—হ্যাঁ।

—বলুন।

—লিস্টে দেখেছিলাম, এক সেট শেক্সপীয়র আছে।

—আছে বৈকি।

—কিন্তু কই? এখানে তো দেখতে পাচ্ছি না।

—কেন দেখতে পাচ্ছেন না? থাকবারই তো কথা।

সুরজিৎ রায় নিজেই একবার ব্যস্ত হয়ে হলঘরের এদিকে-ওদিকে ঘুরে সন্ধান করতে থাকেন। সত্যিই যে তিনি কাল সন্ধ্যাবেলা নিজের হাতে মরক্কো বাঁধাই সেই শেক্সপীয়রের সব ভল্যুম উপর তলার ঘর থেকে তুলে নিয়ে এসে এই হলঘরের ভেতরে রেখেছিলেন। গেল কোথায়?

অনেক খুঁজেও কিন্তু মরক্কো বাঁধাই সেই এক সেট শেক্সপীয়রকে হলঘরের ভিতরে কোথাও দেখতে পেলেন না সুরজিৎ রায়। মনে পড়ে সুরজিৎবাবুর, এই তো ঠিক এখানে এই পালঙ্কটার উপরে পুরনো খবরের কাগজ পেতে তার উপর বইগুলি তিনি রেখেছিলেন। আরও ভাল করে মনে পড়ে, বইগুলোর দাম নিয়ে মনে মনে একটা আলোচনাও করেছিলেন। অন্তত পনের টাকা পাওয়া যাবে নিশ্চয়। খুব ভাল হয়, যদি পঁচিশ টাকায় বিক্রি হয়ে যায়।

সুরজিৎবাবু একটু অপ্রস্তুত হয়ে আর কুণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করেন—বইগুলো কি আপনি কিনবেন বলে ঠিক করেছেন?

তরুণ ভদ্রলোকও কুণ্ঠিতভাবে হাসেন- কেনবার ইচ্ছা আছে, এই মাত্র বলতে পারি।

সুরজিৎ রায়—তাহলে তো একবার উপরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে হয়। জানতে হয় বইগুলিকে কেউ আবার তুলে নিয়ে চলে গেছে কিনা।

ক্রেতার দল কিন্তু তখন আরও ব্যস্ত হয়ে হাঁক-ডাক করতে শুরু করেছে—কই, সে-সব বস্তু একবার দেখান মিস্টার রায়। লিস্টে দেখলাম, কতগুলো পোখরাজ-টোখরাজ আছে।

ইওরোপিয়ান মহিলাও হাসতে হাসতে এগিয়ে আসেন -ইয়েস্, ইয়েস্, জেম্স্ অ্যাণ্ড জুয়েল্স্ !

সুরজিৎ রায় বলেন—এখনি আনছি।

বোধহয় উপর তলায় যাবার জন্য পাশের ঘরের ভেতরে ঢুকলেন সুরজিৎ রায়। বোধহয়, পাশের ঘরের পরেই বারান্দাটা, তার পরেই উপর তলায় ওঠবার সিঁড়ি।

কিন্তু··· না, উপর তলায় যাবার কোন দরকার হলো না। সুরজিৎ রায় যেন পাশের ঘরে ঢুকেই তখনি আবার বের হয়ে এলেন।

কেউ না দেখুক, দরজার কপাটের ফাঁকের দিকে তাকিয়ে তরুণ ভদ্রলোকের চোখ কিন্তু দেখতে পেয়েছে, এক সুশ্রী বৃদ্ধা মহিলা সুরজিৎ রায়ের হাতে কালো-পাথরের একটা ঝাঁপি তুলে দিলেন। বুঝতে অসুবিধে নেই, মহিলা ঐ বস্তুটি হাতে নিয়ে আগে থেকেই পাশের ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়েছিলেন। আরও একটা কাণ্ড এই কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কপাটের ফাঁকের অনুগ্রহে দেখে ফেলেছেন ভদ্রলোক। মহিলার চোখ দুটো জলে ভিজে গিয়ে চিকচিক করছে। আর বৃদ্ধ সুরজিৎ রায়ও যেন মৃদু স্বরে একটা কথা বললেন—ছিঃ···আর মিছে কেন···। কিন্তু বৃদ্ধা মহিলার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে এক তরুণী যেন হাসিমুখে উৎসাহ জানায়—ঠিক আছে বাবা, তুমি এখন যাও।

আবার একটা উল্লাসের আর বাস্ততার হুড়োহুড়ি। ক্রেতাদের মাথার ভিড় যেন একসঙ্গে মিলেমিশে জমাট হয়ে যায়। সুরজিৎ রায় সেই জমাট মাথার ভিড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আর কালো পাথরের ঝাঁপি খুলে দেখাতে থাকেন—এই যে পোখরাজ, এই যে ফিরোজা।···

এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক বলেন—বাস্, দেখা-টেখা তো হলো; এবার হাঁক শুরু হোক্।

সুরজিৎ বাবু বলেন—হ্যাঁ, শুরু হোক্।

তরুণ ভদ্রলোক হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করেন—কিন্তু···কই, আপনার শেক্সপীয়রের সেট কোথায় গেল ?

সুরজিৎ রায় বলেন—তাই তো, আচ্ছা দেখি একবার। মনে হয় উপর তলাতেই আছে।···আচ্ছা, একবার জিজ্ঞেস করেই দেখি।

পাশের ঘরের ভেতরে চলে যান সুরজিৎ রায়। এবং মাত্র এক মিনিট পরেই ফিরে এসে কুণ্ঠিতের মত বলেন—মাপ করবেন।

তরুণ ভদ্রলোকও কুণ্ঠিতভাবে বলেন—কেন বলুন তো? বইগুলি পাওয়া গেল না?

—পাওয়া গেছে। বইগুলি আছে ঠিকই। কিন্তু বইগুলি বিক্রি করতে একটু অসুবিধে আছে।

—বুঝলাম না।

—আমার মেয়ের ইচ্ছে, বইগুলো যেন বিক্রি না করা হয়। মেয়েটাই বইগুলো ছাড়তে চাইছে না।

একটু থেমে নিয়েই কুণ্ঠিতভাবে হাসতে থাকেন সুরজিৎ রায়—ব্যাপার এই যে, মেয়েটা লেখাপড়া খুব ভালবাসে। অগত্যা ···।

তরুণ ভদ্রলোক যেন একটু ক্ষুব্ধভাবে বলেন এটা কিন্তু অন্যায় হলো।

সুরজিৎ রায়—কেন?

—আমি যে বইগুলি কেনবার আশা করে এতদূরে এসেছি। নইলে আসতাম না।

—মশাই কি কলকাতা থেকে এসেছেন?

—হ্যাঁ।

—কলকাতা থেকে এখানে আসা আর যাওয়ার খরচ বোধহয়··· মোটামুটি সাত-আট টাকার মত হবে।

—হতে পারে।

—আমি যদি আপনার ক্ষতিপূরণ করে দিই, তবে নিশ্চয় আপনার কোন অভিযোগ থাকবে না।

—থাকবে বৈকি।

নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবেন সুরজিৎ রায়। তারপরেই

একটা হাঁপ ছাড়েন।—আচ্ছা, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। এদিকের ঝঞ্ঝাট চুকে যাক্, আপনাকে বইগুলি পাইয়ে দিতে পারি কিনা দেখি।

ক্রেতাদের মধ্যে অনেকেই এবার যেন একটু অশান্ত হয়ে ব্যস্ত অনুরোধের শোরগোল তুলতে থাকেন।—আর দেরি করা উচিত নয় মিস্টার রায়।...আমাদের সময়ের দাম আছে।...আমাদের অন্য কাজ আছে।...এবার বিজনেস্ শুরু করুন!

না, আর দেরি করতে হবে না। কারণ, নীলাম হাঁকবার ভার যার উপর দিয়েছেন সুরজিৎ রায়, সেই যুগল সরকারও এসে গিয়েছে। যুগল সরকার বলেছিল, যত টাকায় বিক্রি করিয়ে দেব, তার শতকরা পাঁচ আমাকে দেবেন, তাহলেই হবে।

কী ভয়ানক উৎসাহের সঙ্গে হাঁক দিতে পারে যুগল সরকার। এক গালে একটা জর্দা-ভরা পান ঠেসে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা ক্ষিপ্ত উল্লাসের রব ছাড়ে যুগল সরকার—মেহগনির পালঙ্ক; প্রত্যেকটি এক শো টাকা। মোট দশটি একহাজার টাকা। মেহগনির পালঙ্ক; লখনউ কারিগরের হাতের কাজ, চমৎকার...ওয়াণ্ডারফুল...চিড় নেই, ফাটল নেই, পোক্ত জবরদস্ত সুন্দর পালঙ্ক, জলদি বোলিয়ে...এখনি বলুন...একহাজার টাকা।

যুগল সরকারের গলার আওয়াজ; শুব্ধ জয়বিলাসের পাঁজর যেন চড়বড় করে ফেটে ফেটে চিৎকার করছে। যুগল সরকারের একগালের পানও রক্তাক্ত হয়ে উঠছে। তরুণ ভদ্রলোকের কানের কাছে মৃদুস্বরে বিড়বিড় করেন সুরজিৎ রায়—আপনি একটু এগিয়ে যেয়ে দাঁড়ান। জিনিসগুলো দেখুন।

—ওসবে আমার কোন দরকার নেই।

—এসব কোন জিনিসেই কি আপনার কোন শখ কিংবা আগ্রহ...।

—না।

—তবে কি শুধু...

-হ্যাঁ, আমার ইচ্ছা শুধু ঐ...।

—ঐ মরক্কো বাঁধাই এক সেট শেক্সপীয়র ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তবে তো আপনাকে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে

—অপেক্ষা করতে রাজী আছি।

—খুব ভাল। খুব ভাল কথা। অপেক্ষা করুন তাহলে।

দুই

বিকালের রোদ ক্লান্ত হয়ে যখন চারদিকের বাতাসের উত্তাপ কিছুটা মৃদু করে দিয়েছে, আর জয়বিলাসের দেবদারু ঝিরিঝিরি শব্দ করে শ্বাস ছাড়তে শুরু করেছে, তখন নীলামের হাঁক-ডাকও স্তব্ধ হয়ে যায়।

হ্যাঁ, জয়বিলাসের পাঁজরভাঙা চিৎকারের মত যুগল সরকারের সেই কঠোর চিৎকার আর নেই; আবার একটা পান মুখে পুরেছে যুগল সরকার।

কয়েকটা ট্রাকও চলে এসেছে। কিছু লোকজনও এসেছে। মারোয়াড়ী ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে তাড়া দিয়ে একটা ট্রাকের উপর চারটে পালঙ্ক এরই মধ্যে তুলিয়েছেন। ইওরোপিয়ান মহিলা কালো-পাথরের ঝাঁপিটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে তাঁর মোটর গাড়িতে উঠেছেন।

সবই বিক্রি হয়েছে। শুধু জয়মঙ্গলার মন্দিরের কামানটা ছাড়া। সুরজিৎ রায়ের হাতের কাছে ছোট একটা টেবিলের উপর নোটের তাড়া আর কয়েকটা চেকও জমেছে। যুগল সরকার পানের পিক গিলে নিয়ে একটা খুশির নিশ্বাস ছাড়ে।—মনে হচ্ছে, সাড়ে বারো হাজারেরও বেশি টানতে পেরেছি, স্যার।

সুরজিৎ রায় উদাসভাবে বলেন—মনে হচ্ছে।

সত্যিই আনমনার মত অন্য দিকে তাকিয়ে কি-যেন দেখছেন সুরজিৎ রায়; আর সাদা ভুরু দুটো থরথর করে কেঁপে যেন একটা যন্ত্রণার সঙ্গে লড়াই করছে।

সেই কাশ্মীরী গালিচাটা একটা ট্রাকের চাকার সামনে ধুলোর উপরে লুটিয়ে পড়েছিল, যেটা এখন সাহেবী সাজের বাঙালী ভদ্রলোকের কেনা একটা জিনিস মাত্র। গালিচার উপর জুতোসুদ্ধ একটা পা তুলে দিয়ে আর ঠেলে-ঠেলে বাঙালী ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গের চাপরাশীকে নির্দেশ দিচ্ছেন—ভাঁজ করো না, রোল করে বেঁধে ফেল।

—যুগল! গলার স্বর কাঁপিয়ে আস্তে আস্তে ডাক দেন সুরজিৎ রায়।

—বলুন স্যার। না চেঁচিয়ে বেশ আস্তেই উত্তর দেয় যুগল সরকার।

সুরজিৎ রায় ভদ্রলোককে একটু বুঝিয়ে বলে দিতে পারবে কি, গালিচাটাকে ওভাবে জুতো পায়ে ঠেলাঠেলি করা উচিত নয়। নক্সা ছড়ে যেতে পারে।

হেসে ফেলে যুগল—যেতে দিন স্যার। যার জিনিস সে যদি না বোঝে, তাতে আপনার ভারী বয়ে গেল। বানরের হাতে কমল গেল, কমলের এবার মরণ ভাল।

অনেকক্ষণ পার হয়ে গেল। ক্রেতার দলের প্রায় সকলেই চলে গেল।

জয়বিলাসের হলঘর শূন্য হয়ে গিয়েছে। যুগল সরকার এইবার কথা বলে—তাহলে, আমাকে এবার বিদায় করুন স্যার।

—কত হলো তোমার?

—দিন স্যার; চুক্তি অনুযায়ী তো ছ'শো টাকার মত হয় স্যার, কিন্তু আমার মেহনতের কথা ভেবে নিশ্চয়ই আর কিছু…।

—সাতশো নাও।

—যে-আজ্ঞে স্যার।

যুগল সরকারের পাওনা মিটিয়ে দেবার জন্য টাকা গুনতে গিয়েই হঠাৎ আবার অন্যদিকে তাকিয়ে যেন আর্তনাদ করে উঠলেন সুরজিৎ রায়—ওকি? ও কি? ছি ছি, একি অন্যায়!

আস্তাবলের ভিতর থেকে বুড়ো আরবী রোশনলালকে টেনে নিয়ে এসে যে দেবদারুটার কাছে দাঁড় করিয়েছে একটা শক্ত-পোক্ত চেহারায় লোক, সেই দেবদারুটার দিকে তাকিয়েছেন সুরজিৎ রায়।

নড়তে চায় না, শুধু এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে কাঁকরের উপর পা ঘষে ঘষে ছটফট করছে রোশনলাল। আর, সেই শক্ত-পোক্ত লোকটা, নিশ্চয় রোশনলালের নতুন মালিকের সহিস কিংবা চাকর, রোশনলালের মুখের উপর সপাং করে চাবুক আছড়ে দিয়েছে। আকাশের দিকে মুখ তুলে আর চার পা ছটফটিয়ে ঘোড়াটা যেন নতুন বিস্ময়ের যন্ত্রণায় তড়বড় করছে।

—মারতে বারণ করে দাও যুগল। পনের বছরের মধ্যে ওর গায়ে কোন চাবুকের ছোঁয়া লাগে নি। ছি ছি, ওরা জানে না, রোশনলাল কত শান্ত।

ঘোড়াটার দিকে না তাকিয়ে সুরজিৎ রায়েরই মুখের দিকে তাকিয়ে, আর পান-খাওয়া মুখ হাঁ করে অদ্ভুত রকমের হাসি হাসতে থাকে যুগল সরকার।—এখন আর আপনার তাতে কি এল-গেল, স্যার?

সুরজিৎ রায়—অ্যাঁ? কি বললে?

যুগল সরকার—ছেলে কিনলো যে, ছেলের মুণ্ডু খাবে সে। আমাদের আর বলবার কি আছে?

ক্লান্ত মানুষের মত আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকেন সুরজিৎ রায়। মাথা ঝুঁকিয়ে টেবিলের উপর রাখা সেই নোটগুলির দিকেই আবার তাকিয়ে থাকেন। গুনে গুনে সাতশো টাকা তুলে নিয়ে যুগল সরকারের হাতের দিকে এগিয়ে দিয়ে কি যেন বলতে চেষ্টা করেন।

টাকা হাতে নিয়ে যুগল সরকার বলে—কিছু বলছেন নাকি স্যার ?

—বলছি, আমার রোশনলালকে আমি কোনদিন কোন রাগের ভুলেও মারিনি। সে-বছর গিয়েছিলাম শোনপুর, হরিহর ছত্রের মেলা দেখতে। ঘোড়া কেনবার কোন ইচ্ছে ছিল না। তবু, হঠাৎ…

বোধহয় বুঝতে পারেননি সুরজিৎ রায়, যুগল সরকার চলে গিয়েছে। সুরজিৎ রায় যেন কলের মানুষের মত কথা বলতে থাকেন। —হঠাৎ রোশনলালের দিকে চোখ পড়তেই কেমন যেন মায়ায় পড়ে গেলাম। রোশনলালের কাছে এসে দাঁড়াতেই সেটা আমার কাঁধের উপর গলাটাকে এলিয়ে দিল।

চম্‌কে ওঠেন সুরজিৎ রায়।—অ্যাঁ ? আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ? যুগল কোথায় ?

তরুণ ভদ্রলোক হাসতে থাকেন—ও ভদ্রলোক চলে গেছেন। আমি এতক্ষণ আপনার কাছে এখানেই দাঁড়িয়েছিলাম।

সুরজিৎ বাবু হাসেন—আমি আমার খুব আদরের ঘোড়া রোশনলালের গল্প বলছিলাম।

—সেটা বুঝতে পেরেছি।

—আমার পনের বছরের আদরের ঘোড়া।

—বিক্রি না করলেই ভাল করতেন।

—ঠিক বলেছেন।

সুরজিৎ রায়ের সাদা মাথাটা আবার কেঁপে ওঠে, মুখ তুলে দেবদারুটার দিকে তাকান। তারপরেই হাসতে চেষ্টা করেন।—যাক, চলে গিয়েছে রোশনলাল। যাই হোক্…আমার রোশনলালের বুদ্ধির গল্প একটু শুনবেন ?

—বলুন।

—সেবার পালামৌ গিয়েছিলাম। লাতেহারের কাছে একটা বাড়ি ভাড়া করে তিনমাস ছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, শিকার করে দিন কাটিয়ে দেব। সেইসময় প্রায়ই রোশনলালের সওয়ার হয়ে কোন এক গ্রাম্য

জমিদারের বাড়িতে গিয়ে অতিথি হ'তাম। একটা দুটো দিন কাছের জঙ্গলে শিকারের চেষ্টায় ঘোরাফেরা করেই ফিরে যেতাম। এই সময় একদিন…শুনলে আপনি বোধহয় সহজে বিশ্বাস করতে পারবেন না… থাক সে কথা।

সুরজিৎ রায়ের গলার স্বর হঠাৎ যেন অদ্ভুতভাবে কেঁপে উঠেই একটা উদাস নিশ্বাসের শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে যায়। তরুণ ভদ্রলোক বলেন—বলুন, বিশ্বাস করবো না কেন?

সুরজিৎ রায়—একদিন এক গাঁয়ের জমিদার বাড়িতে আমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। দু'বার বমি করেছিলাম আর বেশ কাহিল হয়ে একটা খাটিয়ার উপর শুয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ শোরগোল শুনলাম, বাবুকা ঘোড়া ভাগ গিয়া। চোখ মেলে দেখতে পেলাম, আমগাছটার কাছে ঘোড়াটা নেই। দড়ি ছিঁড়ে পালিয়েছে। ধানক্ষেতের আলের উপর দিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে ঘোড়াটা। কিন্তু…।

হঠাৎ গল্প থামিয়ে হেসে ফেললেন সুরজিৎ রায়। তার পরেই বললেন—ঘণ্টা পাঁচেক পরে দেখলাম, আমার সহিস কাঙালীরাম ঘোড়ার পিঠে চড়ে খুট্‌খুট্ করে তুল্‌কি চালে এগিয়ে আসছে; আর পিছু পিছু আসছে ডাক্তার ব্রজবাবুর পালকি। অর্থাৎ, পালকি চড়ে ডাক্তার ব্রজবাবুই আসছেন।

—এটা কি করে সম্ভব হলো?

—সেই কথাই বলছি। আমার রোশনলাল ছুটে গিয়ে সোজা লাতেহারের ডাক্তার ব্রজবাবুর বাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ছটফট করছিল। ঘোড়াকে সওয়ারহীন অবস্থায় দেখে ব্রজ ডাক্তার কিছু একটা সন্দেহ করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার বাসায় লোক পাঠিয়ে খোঁজ করেছিলেন। তারপরেই পালকি করে সোজা সেই গাঁয়ে উপস্থিত হয়ে একেবারে আমার শিয়রের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

হেসে ফেলেন তরুণ ভদ্রলোক—তাহলে, আপনার ঘোড়া রোশনলালই ডাক্তার ডেকে এনেছিল।

—তাতে কি আর কোন সন্দেহ আছে ?·· মশায়ের কি কোন আদরের ঘোড়া ছিল ?

তরুণ ভদ্রলোক কুণ্ঠিতভাবে এবং হঠাৎ যেন ভীরুর মত চোখ করে হাসতে চেষ্টা করেন।—আজ্ঞে না।

—মশায়ের কি করা হয় ?

আমি একটা কলেজে ছাত্র পড়াই···তার মানে লেকচারার।

বাঃ, অতি চমৎকার কাজ করেন। বড়ই সম্মানের কাজ।

—আজ্ঞে ?

—আপনি জ্ঞানী মানুষ।

তরুণ ভদ্রলোক লজ্জিতভাবে হাসেন—এতটা বাড়িয়ে ভাববেন না। হ্যাঁ··তবে বই-টই পড়তে ভালবাসি। শখ বলতে ঐ একটি শখ, ভাল বই কেনা।

—আপনার লাইব্রেরিও কি কলকাতাতেই ?

তরুণ ভদ্রলোক আরও কুণ্ঠিতভাবে হাসতে চেষ্টা করেন।—আজ্ঞে না, লাইব্রেরি বলতে যা বোঝায়, সে-ধরনের কোন সম্পত্তি আমার নেই। একটা শেলফ্ আর একটা আলমারি আছে। শ'তিনেক বই আছে, এই মাত্র। এক সেট শেক্সপীয়র কেনবার শখ অনেকদিন থেকেই ছিল। সেই জন্যেই···।

—ওঃ হো, ভুলেই গিয়েছিলাম যে আপনি তাহলে আমার শেক্সপীয়রের সেট কেনবার জন্যেই বসে আছেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কত টাকা দিতে চান ?

—আপনি কত টাকায় ছাড়বেন বলে ঠিক করেছিলেন ?

—আমি তো ভেবেছিলাম, পঁচিশ টাকা পেলেই ছেড়ে দেব।

—আমি পঁচিশ টাকা দেব।

—বেশ।

আবার বাড়ির ভিতরে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন সুরজিৎ রায়;

কিন্তু যেতে পারলেন না। একটা চাকর মস্ত বড় একটা কাঠের ট্রে-র উপর খাবার সাজিয়ে নিয়ে এসেছে। ট্রে-র উপর শ্বেতপাথরের দুটো গেলাস।

একটা গেলাস হাতে তুলে নিয়েই সুরজিৎ রায় খুশি হয়ে বললেন —এটা মিছরির পানা, এটা আমার। ওটা নিশ্চয় আনারসের রসের শরবৎ, ওটা আপনার। আর, এই সব খাবার আপনারই জন্য। আমি সন্ধ্যাবেলা এসব কিছু খাই না।

তরুণ ভদ্রলোক বিব্রতভাবে আপত্তি করেন—না না, আমিও এসব কিছু খাই না, খাব না। আপনি এসব ফেরত নিয়ে যেতে বলুন।

সুরজিৎ রায় মৃদুভাবে হাসেন—তা হয় না। আপনি এত কষ্ট করে সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে বসে থাকতে পেরেছেন, আর আমরা আপনাকে সামান্য দু'চারটে মিষ্টিও খাওয়াবো না, এ তো হতে পারে না মশাই।

চুপ করে, ভয়ানক এক অস্বস্তির জ্বালা সহ্য করে, আর, যেন ভীরু অপরাধীর মত মাথা হেঁট করে খাবার খেতে থাকেন তরুণ ভদ্রলোক। এবং, খাওয়া শেষ হতেই ব্যস্তভাবে বলেন—আর আমার দেরি করা সম্ভব নয়। আপনি দয়া করে একটু খোঁজ করুন। বইগুলো…।

উঠলেন সুরজিৎ রায়। পাশের ঘরের দরজার কপাট ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন; সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরের ভিতরের আলোও যেন কপাটের ফাঁক দিয়ে উথলে উঠলো। আর, সুরজিৎ রায় ব্যস্তভাবে দরজা বন্ধ করে দিলেও একটা কপাট যেন সেই ব্যস্ত শব্দের গায়ে ঠোকর খেয়ে আবার খুলে যায়। ঘরের ভিতরের চেহারাটাও তরুণ ভদ্রলোকের চোখে পড়ে যায়। একটা টেবিলের দু'পাশে কারা দু'জন বসে আছে। একজনকে চিনতে পারা যায়; বৃদ্ধা মহিলা, যিনি আজ বিকালে ঐ ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে সুরজিৎ রায়ের হাতে কষ্টি-পাথরের ঝাঁপিটা তুলে দিয়েছিলেন আর কেঁদেছিলেন। ইনি নিশ্চয় সুরজিৎ

রায়ের স্ত্রী। কিন্তু অন্য যে-জন টেবিলের ওদিকে একটা চেয়ারের উপর বসে আছেন, তিনি কে? সুরজিৎ রায়ের মেয়ে?

কপাটটা আবার বন্ধ হয়েও সামান্য একটু ফাঁক রেখে দিল। তাই পাশের ঘরের মৃদু শব্দগুলিকেও মাঝে মাঝে বেশ স্পষ্ট করে শুনতে পান তরুণ ভদ্রলোক। সুরজিৎ রায় বলছেন—না, ভাল দেখায় না। ভদ্রলোককে যখন এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছি, আর বইগুলো বিক্রি করবো বলে কথা দিয়েছি, তখন…।

বৃদ্ধা মহিলা বললেন—একটু বুঝিয়ে বলে দাও।

সুরজিৎ রায়—কি বলবো, বল?

বৃদ্ধা মহিলা—সত্যি কথাই বলে দাও, বইগুলো এখন সুলতার পড়ার জন্য খুব দরকার। বলে দাও, সুলতা এখন প্রাইভেট বি-এ দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে। কাজেই বইগুলো বিক্রি করা সম্ভব নয়।

পাশের ঘরের দরজার কপাট ঠেলে আবার বের হয়ে আসেন সুরজিৎ রায়; আর, বেশ কুণ্ঠিতভাবে, যেন মার্জনা চাইবার ভঙ্গীতে বলতে থাকেন—একটু সমস্যায় পড়েছি, আপনাকে বলতে বেশ কুণ্ঠা হচ্ছে…।

—তবু বলুন।

—বইগুলো এমন বিক্রি না করাই ভাল ছিল। মেয়েটা এবার প্রাইভেটে বি-এ দেবে। বইগুলো এখন ওরই দরকার।

তরুণ ভদ্রলোক—কিন্তু একথাটা এত দেরিতে আপনাদের মনে হলো কেন? নীলামের বিজ্ঞাপনে জিনিসের নামের লিস্ট দেবার সময় কি জানতেন না যে, কারও বি-এ পড়ার জন্য বইগুলোর দরকার আছে?

সুরজিৎ রায়—আমি ঠিক জানতাম না। আর ওরাও আমাকে মনে করিয়ে দেয় নি?

—ওরা কারা?

—আমার মেয়ে সুলতা আর ওর মা।

—ওঁদের এখন কি ইচ্ছে ?

—ওদের ইচ্ছে, বইগুলো বিক্রি না করা।

—বেশ। আমি তাহলে উঠি।

উঠে দাঁড়ান তরুণ ভদ্রলোক। সুরজিৎ রায় অপ্রস্তুতভাবে বলেন—আপনি কি বিরক্ত হলেন ?

—না।

—কিন্তু…?

—কি ?

—আপনি হাসছেন বলে মনে হচ্ছে। আমাদের ব্যবহারে আপনি একটু আশ্চর্য হয়ে…

—আশ্চর্য হয়েছি ঠিকই ! কিন্তু যাক্ সে-সব কথা। বইগুলো যে একজনের কাজে লাগবে, সেটাই হলো সবচেয়ে ভাল কথা।

তরুণ ভদ্রলোকের মুখে সত্যিই যেন অদ্ভুত রকমের একটা হাসির ছায়া লেগে ছিল। বিরক্তির হাসি নিশ্চয় নয়। একটা বিস্ময়ের হাসি ঠিকই ; কিন্তু সেই বিস্ময়ও যেন একটু ঠাট্টার সঙ্গে একটু করুণা মেশানো একটা বিস্ময়।

সুরজিৎ রায়ের শিথিল সাদা ভুরু দুটো যেন হঠাৎ টান হয়ে আর বেশ একটু শক্ত ভঙ্গি ধরে কেঁপে ওঠে। তরুণ ভদ্রলোকের কথাগুলির অর্থ, আর সেই অদ্ভুত আশ্চর্যের হাসিটারও অর্থ যেন বুঝতে চেষ্টা করছেন সুরজিৎ রায়।

—আপনি ঠাট্টা করছেন না তো ? সুরজিৎ রায়ের গলার স্বরটা যেন চাপা ঝড়ের শব্দের মত।

তরুণ ভদ্রলোক সেই ভঙ্গীতেই হেসে হেসে উত্তর দেন—না।

—আপনি দয়া-টয়া দেখাচ্ছেন না তো ? সুরজিৎ রায়ের চোখ দুটো যেন ধিক ধিক করে জ্বলে। নিঃস্ব রিক্ত হৃতসর্বস্ব ও দরিদ্র জয়বিলাসের বুকের কোটরের মত এই শূন্য ও মলিন হলঘরের ভিতরে যেন বনেদী অহঙ্কারের সমাহিত একটা দীর্ঘশ্বাস

জ্বলে উঠতে চাইছে। সত্যিই কি আধ-ময়লা একটা টুইলের কামিজ স্পর্ধাভরে জয়বিলাসের আত্মাকে আজ অনুগ্রহ করতে চাইছে?

তরুণ ভদ্রলোক সেইভাবেই হাসেন—না না; দয়া-টয়ার কথা নয়। তবে কিনা…অর্থাৎ…বলতে বাধা নেই…মনে হচ্ছে, হার নেসেসিটি ইজ গ্রেটার দ্যান মাইন।

পাশের ঘরের দরজার কপাট আবার খুলে যায়। সেই চাকরটা আবার হলঘরে ঢোকে, যে চাকরটা কিছুক্ষণ আগে খাবারের ট্রে দুহাতে বয়ে নিয়ে এসেছে।

চমকে ওঠেন তরুণ ভদ্রলোক। দেখতে পান সত্যিই, সুন্দর মরক্কো বাঁধাই এক-গাদা বই নিয়ে এসেছে চাকরটা। সত্যিই এক সেট শেক্সপীয়র।

সুরজিৎ রায় প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন—হ্যাঁ…খুব ভাল হলো।

তরুণ ভদ্রলোক কি হলো?

সুরজিৎ রায়—আপনার আর দয়া-টয়া দেখাবার দরকার হলো না। আসুন, তাড়াতাড়ি করুন। বইগুলি নিয়ে যান।

—আজ্ঞে?

—পঁচিশ টাকা দাম। দিয়ে ফেলুন। বইগুলো নিয়ে চলে যান।

তরুণ ভদ্রলোক বলেন—বেশ তাই করছি। কিন্তু…আমি কিন্তু পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত উঠবো বলে তৈরী হয়ে এসেছিলাম।

সুরজিৎ রায়—কি বললেন?

তরুণ ভদ্রলোক—আমি এখনও পঞ্চাশ টাকা দিতে রাজী আছি।

—কেন?

—বুঝতেই তো পারছি, আপনি নেহাৎ দরকারে পড়ে, নিতান্ত অভাবের জন্যেই বিক্রি করছেন।…সবই তো কয়েকটা টাকার জন্য? সুতরাং…

—সুতরাং···বলতে গিয়ে সুরজিৎ রায়ের মাথাটা যেন ক্ষুব্ধ অজগরের মাথার মত তুলে ওঠে।—সুতরাং আপনিও আমাকে দয়া করবেন ; এই তো ?

—না, দয়া নয়। আমার তো কোন ক্ষতি নেই। বইগুলোর দাম আজকালকার বাজারে তিনশো টাকার কম হবে না। পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনলেও আমার যথেষ্ট লাভ।

সুরজিৎ রায়—তার চেয়ে ভাল, আমি বলি···

তরুণ ভদ্রলোক—বলুন।

সুরজিৎ রায়—আপনাকে কিছুই খরচ করতে হবে না। পঁচিশ টাকাও না। এক পয়সাও না। আপনি বইগুলি নিয়ে যান।

পাশের ঘরের ভিতরে বাতাসটা যেন অদ্ভুত এক কলহাস্যের সঙ্গে ঝঙ্কার দিয়ে বেজে উঠলো। না, এই হাসি সুরজিৎ রায়ের স্ত্রীর হাসি নিশ্চয় নয়। বুঝতে অসুবিধা নেই, সুরজিৎ রায়ের মেয়ে সুলতার অন্তরাত্মা যেন প্রচণ্ড এক তৃপ্তির সুখে ছটফট করে হেসে উঠেছে। যেন একটা সুন্দর প্রতিশোধের হঠাৎ উল্লাসের হাসি। যেন এক ভিক্ষুকের লোভের কান্নাকে ঠাট্টা করে আর বকসিস দিয়ে খুশি করে দেবার হাসি।

স্পষ্ট করে শুনতে পান তরুণ ভদ্রলোক। সুরজিৎ রায়ের মেয়ে বলছে—এরা এই রকমেরই হয়ে থাকে, মা। লেখাপড়া শিখুক আর যাই করুক, স্বভাবটা পিঁপড়ের মত।

সুরজিৎ রায়ের স্ত্রী বলছেন -যাক্ গে, এসব কথায় কাজ নেই।

সুরজিৎ রায়ও এবার যেন একটা রূঢ় হাসির শব্দ সামলে নিয়ে অনুরোধ করেন—আসুন তাহলে। বইগুলো নিয়ে যান।

তরুণ ভদ্রলোক বলেন—না।

—কিসের না ?

—আমি যাচ্ছি, কিন্তু বইগুলো নেব না।

—কেন ?

—আপনাদের কারও অহঙ্কারের চেয়ে আমার অহঙ্কার কিছু কম নয়।

—কি বললেন ?

—বেশ স্পষ্ট করেই তো বলছি। শুনতে পেয়েছেন নিশ্চয়।

—শুনেছি। অপ্রসন্নভাবে কথাটা বলে দিয়েই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেন সুরজিৎ রায়। আর বুঝতেও পারেন যে, অল্পবয়সের সেই ভদ্রলোক চলে যাচ্ছেন।

জয়বিলাসের হলঘর থেকে বের হয়ে চওড়া পাথরের সিঁড়ির ধাপ ধরে আর চুপ-চাপ হেঁটে সামনের দেবদারুটার কাছে এলো-মেলো করে ছড়ানো লাল কাঁকরের দিকে চলে যাচ্ছেন এই ছোক্‌রা ভদ্রলোক। নেমে যাচ্ছেন ভদ্রলোক। আধ-ময়লা টুইলের কামিজ আর আধ-ময়লা ধুতি, হাতে একটা সাধারণ কাপড়ের ঝোলা, কোন্ এক কলেজে ছাত্র পড়ান ভদ্রলোক; কে জানে কত টাকা মাইনে পান। কিন্তু চলে যাবার ভঙ্গীটা দেখলে মনে হয়, যেন মস্ত বড় একটা অহঙ্কারের মূর্তি তর তর করে হেঁটে চলে যাচ্ছে। কিসের অহঙ্কার কে জানে ? পয়সার অহঙ্কার যে নয়, সেটা তো ভদ্রলোকের আধ-ময়লা টুইলের কামিজ দেখেই বোঝা যায়। তবে কি বিদ্যার অহঙ্কার ? কলেজের ছাত্রের কাছে লেকচারী করবার মত বিদ্যা তো কতজনেরই আছে ? জয়-বিলাসের বাজার সরকার ছিলেন যিনি, সেই সদানন্দ চাটুজ্জের ছেলেটাও তো লেকচারার ; সে ছেলে পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত এই জয়বিলাসের ভাত খেয়ে দিন কাটিয়েছে। এই ভদ্রলোকের মত দেখতে কত চেহারা একদিন এই পুরনো রাজবাড়ির থামের ছায়ার কাছে ঘুরঘুর করছে। সাহায্য চাইতে এসেছে ; সাহায্য পেয়ে চলে গিয়েছে।

কিন্তু সুরজিৎ রায়ের দু'চোখের চাহনিটা হঠাৎ যেন ক্লান্ত হয়ে আবার শিথিল হয়ে যায়। লাল কাঁকরের উপর দিয়ে যেন ছোট্ট একটা ছায়া হয়ে চলে যাচ্ছে, সেই লেকচারার ভদ্রলোক। সুরজিৎ রায় যেন দেখছেন, অকারণে লাঞ্ছিত একটা মানুষ চুপ-চাপ চলে যাচ্ছে। সস্তায়

এক সেট শেক্সপীয়র কিনবে ; খুব সামান্য একটা আশা নিয়ে ভদ্রলোক এসেছিলেন, কিন্তু সে আশা সফল হলো না। যারা এসেছিল তারা সকলেই কিছু না কিছু কিনেছে, আর খুশি লুটেরার মত চেঁচিয়ে লাফিয়ে, শিস দিয়ে আর গাড়ির হর্ন বাজিয়ে চলে গিয়েছে। সব চেয়ে বেশি সময় অপেক্ষা করলো যে, সব চেয়ে বেশি শান্ত হয়ে বসেছিল যে, সব চেয়ে কম দামের জিনিস কিনতে এসেছিল যে, সে বেচারাই ব্যর্থ আশার বেদনা নিয়ে চলে যাচ্ছে। অথচ বেচারার কোন দোষ নেই, কোন ভুলও সে করে নি।

—সুলতা! গম্ভীর স্বরে ডাক দেন সুরজিৎ রায়।

—কি বাবা? পাশের ঘর থেকে সুলতা বের হয়ে এসে সুরজিৎ রায়ের কাছে দাঁড়ায়।

সুরজিৎ রায়—এটা কিন্তু একটা অন্যায় হয়ে গেল।

—কিসের অন্যায়?

—ভদ্রলোকের একটা কথায় আমাদের এত রাগ করা উচিত হয়নি।

—সামান্য একটা লোক অপমান করে কথা বলবে, রাগ করবো না কেন?

—অসামান্য একটা লোক অপমান করে কথা বললে কি রাগ করা অন্যায় হতো?

—না, তা নয়। তবে ...।

—তবে ভদ্রলোককে সামান্য-টামান্য বলবার দরকার কি?

সুরজিৎ রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সুলতা কি-যেন দেখতে পায়; কি যেন সন্দেহও করে। কিংবা একটা বিস্ময়কর কিছুও হতে পারে। সুরজিৎ রায়ের চোখের দৃষ্টিতে যেন একটা অনুশোচনার ছায়া।

সুলতা বলে—তুমি যেন আমাকেই দোষী বলে মনে করছো?

হাসতে চেষ্টা করেন সুরজিৎ রায়।—দোষী মনে করছি না। কিন্তু মনে হচ্ছে, ভুল হয়েছে। তোমার এবং আমারও।

—কেন?

—ভদ্রলোক না হয় একটা করুণার কিংবা উদারতার ভাব দেখিয়ে বইটার দাম পঞ্চাশ টাকা দিতে চেয়েছিলেন; তাতে আমাদের এত ক্ষেপে যাবার কোন দরকার ছিল না। তা ছাড়া, বই বিক্রির কথা বলে বই বিক্রি না করার ইচ্ছা, এটা তো আমাদেরই প্রথম অন্যায়।

সুলতা বলে—হঁ্যা, আমিই অন্যায় করেছি।

সুরজিৎ রায়—যাক্ যা হবার তা তো হয়ে গিয়েছে। এসব নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করবারও দরকার নেই। এবার ভাল করে পড়াশোনা কর, যেন একবারেই পাস করে…।

সুরজিৎ রায়ের অনুরোধের কথা শেষ হবার আগেই চলে যায় সুলতা।

তিন

রায়মানিকপুরের পুরনো রাজবাড়ি জয়বিলাসের দোতলার একটি ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলে। বি-এ পরীক্ষার পড়া নিয়ে রাত জাগতেও কোন অনিচ্ছা নেই সুলতার।

বি-এ পাস করবার পর? বাবার কথাটার মধ্যেও সুলতার জীবনের এই প্রশ্নের কোন উত্তর ছিল না। সুরজিৎ রায় যেন তাঁর আদরের মেয়ের ভবিষ্যৎটাকে স্পষ্ট করে বলে দিতে গিয়েও থেমে গিয়েছেন; যদিও সুরজিৎ রায়ের অজানা নয় যে, বি-এ পাস করবার পরেই বিয়ে হয়ে যাবে সুলতার। কার সঙ্গে বিয়ে হবে, সেটাও সুরজিৎ রায়ের অজানা নয়। প্রভাময়ীও জানেন, দিব্যেন্দুর ইচ্ছা এই যে, বিয়ের আগে বি-এ পাস করে নিক সুলতা।

আবার বিলেত যাবে দিব্যেন্দু। কিন্তু এবার আর একা যেতে চায় না। এবার সস্ত্রীক বিলেতে গিয়ে অন্তত একটা বছর পার করে দিয়ে তবে দেশে ফিরবে দিব্যেন্দু। দিব্যেন্দুর এই ইচ্ছার কথাটা কেমন করে সুরজিৎ রায়ের কানেও এসে পৌঁছেছে।

শুনে খুশি হয়েছিলেন প্রভাময়ী ; কিন্তু কে জানে কেন, খুশি হতে পারেন নি সুরজিৎ রায়।—এটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না প্রভা। কেউ বিয়ে করবে, সস্ত্রীক বিলেতে গিয়ে থাকবে, এই ইচ্ছার মধ্যে আবার বি-এ পাস করবার প্রশ্ন এসে ঢোকে কেন? এটা কি একটা শর্ত?

প্রভাময়ী—না না, শর্ত-টর্ত নয়। এটা একটা শখ।

—কেমন শখ?

প্রভাময়ী হাসেন—তুমি সেকেলে মানুষ : তুমি বুঝবে না।

—সত্যিই বুঝতে পারি না প্রভা।

—মেয়েরও যে তাই ইচ্ছে।

—হলোই বা মেয়ের ইচ্ছে। কিন্তু দিব্যেন্দু কেন দেরি করতে চায়? মেয়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন বা দেখা দেয় কেন, যদি দিব্যেন্দুর বিয়ে করবার ইচ্ছা হয়ে থাকে?

প্রভাময়ী আবার হাসেন—তুমি তোমার বংশের খাঁটি মানুষটির মত কথা বলছো, কিন্তু আজকাল ওরকমের মন নিয়ে কেউ চলে না।

ঠিক কথা, সুরজিৎ রায় তাঁর বংশের খাঁটি মানুষটির মত মন নিয়ে বিয়ে করেছিলেন এবং আজও বুঝতে পারেন না, সেই মনের ধর্মে কোন ভুল আছে কিনা। সাতপুরুষ আগের সংসারচন্দ্র রায় যে গৌরীনগরের পরগণাইত মাধব রায়ের সুন্দরী মেয়েকে জোর করে ধরে এনে বিয়ে করেছিলেন, সে-কথা রায়মানিকপুরের এই রায়েদের কুলপঞ্জীতেও লেখা আছে।

প্রভাময়ীও ভুলে যান নি, চল্লিশ বছর আগে এই সুরজিৎ রায় কি-বেশে কেমন মূর্তি ধরে আর কি-ভাবে প্রভাময়ীর চোখের সামনে

প্রথম দেখা দিয়েছিলেন। সেটা ছিল বিয়েরই অনুষ্ঠানের অঙ্গ, সবচেয়ে বেশি আনন্দের আর এক চমৎকার একটা কোলাহলের আক্রমণ। সুরজিৎ রায়ের হাতে তলোয়ার, মাথায় জরিদার পাগড়ি, রেশমী ঝালর দিয়ে ঢাকা মুখ। শানাইয়ের মিষ্টি সুরের সঙ্গে নাগাড়ার শব্দও উদ্দাম হয়ে উঠেছিল। আলোয় ঝলমল করছিল তিলকহাটির জমিদারের বাড়ী। বরবেশী সুরজিৎ রায় তলোয়ার হাতে তুলে, দ্বারপথের যত বাধার ভিড় ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে একেবারে অন্তঃপুরের একটি কক্ষের ভিতরে ঢুকে রঙীন বিষ্টুপুরীতে আর চন্দনের তিলকে সাজানো প্রভাময়ীর একটা হাত শক্ত করে ধরেছিলেন।

কাকিমারা আর বউদিরা শিখিয়ে দিয়েছিলেন, প্রভাও যেন খুব আপত্তি করে, যেতে না চায়। আর, সত্যিই, প্রভাময়ীর সেই ভীরু-মিষ্টি চেহারাটা কিছুক্ষণের জন্য শক্ত হয়ে একটা কঠোর আপত্তির মূর্তির মত দাঁড়িয়েছিল। কপাটের একটা কড়াকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছিল প্রভা। কিন্তু বর সুরজিৎ রায় একটুও বিচলিত হন নি। বেশ জোরে, সত্যিই একটা হেঁচকা টান দিয়ে প্রভাময়ীকে ঘরের দরজার বাইরে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়েছিলেন। তারপরেই, কলকল করে হেসে উঠেছিলেন কাকিমারা আর বউদিরা। বেজে উঠলো শাঁখ। পুরোহিতও এগিয়ে এসে হাসলেন—এবার আপনারা সরে যান, এবার আমার কাজ।

জোর করে ধরে বিয়ে করা একদিন সুরজিৎ রায়ের বংশের নিয়ম ছিল; সে নিয়মের অভিনয় করে সুরজিৎ রায়ও বিয়ে করেছেন। রায়মানিকপুরের রায়েরা নাকি বাঙালী রাজপুত, অবাঙালী শর্মাজী তাই বলে। কিন্তু সুরজিৎ রায় জানেন, কুলপঞ্জীও বলে যে, তাঁদের আদিপুরুষ এক রাজপুত সিপাহী একদিন সুদূর বুঁদিগড় থেকে এসে এই রায়মানিকপুরে ঘর বেঁধেছিলেন। এই বংশের তিন নারী স্বামীর সঙ্গে সহমরণ করে সতী হয়েছেন। জয়বিলাসের দক্ষিণের বাগানে যে পুকুরটা দেখা যায়, তার একটা ঘাটের নাম আজও

সতীঘাট। স্বামীর চিতায় ওঠবার আগে ঐ ঘাটে স্নান করেছিলেন রায়বাড়ির বধূ।

গল্পগুলি সুলতাও শুনেছে।—ও নিয়ম কিন্তু বড় সাংঘাতিক নিয়ম। হেসে হেসে প্রভাময়ীর সঙ্গে অনেক তর্কও করেছে সুলতা।

এখনও মাঝে মাঝে যে সেজমামা আসেন, তাঁর কাছেও গল্প শুনেছে সুলতা —তোর বাবার বিয়েতেও নিয়মের একটুও নড়-চড় হয় নি।

সুলতা—নিয়ম মানে একটা নকল কাণ্ড, এই তো?

—না; ঐ নকল কাণ্ডের মধ্যেই সত্যি সত্যি রক্তারক্তি ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল।

—তার মানে?

—তার মানে, সুরজিৎদা সত্যিই সিরিয়াস হয়ে তলোয়ার হাতে নিয়ে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

প্রভাময়ী এসে লজ্জিতভাবে হেসে বাধা দেন।—আপনি আবার কবেকার যত বাজে কথা নিয়ে পড়লেন কেন সেজদা?

সেজমামা—বাজে কথা যে নয়; সেটাই এই আধুনিকা মেয়েটিকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

সুলতা—আপনি বলুন সেজমামা।

সেজমামা -সুরজিৎদার হাতের একটা ধাক্কা খেয়ে আমি ছিটকে পড়েছিলাম। বড়দার এক শালা বেচারা ঢাল তুলে আর লাফ দিয়ে বাধা দিতে গিয়ে সত্যিই আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠেছিল।

সুলতা—কেন?

সেজমামা—সুরজিৎদা যে সত্যিই তলোয়ার তুলেছিলেন।

সুলতা—শেষ পর্যন্ত কি হলো?

সেজমামা —শেষে আমার মাথায় আর বড়দার শালা বেচারার হাতে ব্যাণ্ডেজ। বেশ জখম হতে হয়েছিল।

পড়বার জন্য রাত জাগতে হবে; কিন্তু পড়ার বদলে আজ যেন শুধু রাত জাগাই সার হবে, সন্দেহ হয় সুলতার। কারণ, এত রাত

হলেও কোন বই-এর একটা পাতাও পড়ে উঠতে পারেনি। পড়তে গিয়েই আনমনা হতে হয়েছে। আর চিন্তার ভিতরে রায়মানিকপুরের পুরনো রাজবাড়ির পুরনো জীবনের যত অদ্ভুত গল্প যেন মুখর হয়ে অদ্ভুত এক উৎপাতের মত্ততায় ছুটোছুটি করেছে।

দিব্যেন্দু কিন্তু বাঙালী রাজপুত নয়। নিতান্ত বাঙালী কায়স্থ। কলকাতার একটি তিনতলা বাড়ির কর্তা, এক রিটায়ার্ড জজের একমাত্র ছেলে দিব্যেন্দু মিত্র চার বছর আগে এম-এ পাস করে এক ব্রিটিশ সদাগরী কোম্পানীর কলকাতা অফিসের ম্যানেজার হয়েছে। সেজমামার মেয়ে নীরদার বিয়েতে কলকাতায় এসেছিল সুলতা; আর বাসঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বরের বিশেষ বন্ধু এই দিব্যেন্দুর সঙ্গে সুলতা প্রথম কথা বলেছিল। সেই যে আলাপ, সে-আলাপ শুধু একটা ক্ষণিক ঘটনার মত ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায় নি। সেজমামার কলকাতার বাড়িতে যতদিন ছিল সুলতা, ততদিনের মধ্যে বড় জোর দুটি কি তিনটি দিন বাদ গিয়েছে, তা ছাড়া প্রত্যেকটি দিনই দিব্যেন্দু এসেছে। সেজমামী একদিন স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসাও করে ফেললেন—কি-রকম যেন মনে হচ্ছে সুলতা?

সুলতা—কি-রকম?

সেজমামী—দিব্যেন্দু রোজই আসছে; তুমি যেন খুশি হচ্ছো মনে হচ্ছে?

সুলতা—মনে হচ্ছে যখন, তখন আর জিজ্ঞেস করবারই বা কি আছে?

সেজমামী—তবে আমি প্রভাদিকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিই?

সুলতা—দিন।

রায়মানিকপুরে ফিরে এসে একটু আশ্চর্য হয়েছিল সুলতা, যেমন বাবা তেমনই মা, দু'জনেই যেন বেশ একটু গম্ভীর। বাবা আর মা কি দিব্যেন্দুর জাতের কথা ভেবে খুশি হতে পারছেন না?

একদিন নিজের কানেই শুনতে পেয়েছিল সুলতা, বাবা মা-র

কাছে কথায় কথায় বলছেন—সত্যি কথা প্রভা, আমার কিন্তু ভাবতে একটু খারাপই লাগছে। দিব্যেন্দু ছেলেটি যদি রাজপুত জাতের ছেলে হতো, তবে খুবই ভাল হতো।

প্রভাময়ী—কেন ?

সুরজিৎ রায়—আমার তাই মনে হয়।

প্রভাময়ী—দিব্যেন্দু কিন্তু বেশ ভাল অবস্থার আর ভাল ঘরের ছেলে। পয়সাকড়ি আছে, ভাল বাড়ী আছে, লেখাপড়ায় ভাল, বাপ জজ ছিলেন, নিজে ভাল চাকরি করে ; আপত্তির কি আছে ?

সুরজিৎ—তবু, কেন যেন ভাল লাগে না। (কলকাতার মানুষ, সে যতই টাকার মানুষ হোক আর শিক্ষিত হোক না কেন, তবু কেমন যেন ···বেশ একটু ছোট নজরের মানুষ ওরা।)

প্রভাময়ী—ওসব কথা আমাদের ভেবে লাভ কি ? আমরা শুধু দেখবো, ছেলেটা তোমার মেয়েকে কি নজরে দেখছে, আর তোমার মেয়েই বা···।

সুরজিৎ রায়—তোমার সেজ বউদি তো লিখেছেন, দু'জনের মধ্যে নাকি ভালবাসা হয়েছে।

প্রভা—তবে আর আপত্তি করবার কিছু নেই।

সুরজিৎ রায়—না, আমি কোন বাধা দেব না। আমি শুধু আমার মনের একটা কথা তোমার কাছে বললাম।

শুনতে পেয়ে খুশি হতে পারেনি সুলতা। বরং ভাবতে বেশ একটু দুঃখই পেয়েছিল সুলতা। সে দুঃখের মধ্যে যেন একটা বিদ্রূপও ছিল। রিক্ত নিঃস্ব জয়বিলাসের সেকেলে গর্বের একটা অসার খোলস যেন এখনও একটা মিথ্যা বড়াই নিয়ে পড়ে আছে, আর ভুল করছে। দিব্যেন্দুর মত ছেলেকে পছন্দ করতে পারছেন না সুরজিৎ রায়, এরচেয়ে করুণ বিস্ময় আর কি হতে পারে ? দিব্যেন্দুর একমাসের রোজগার যে রায়মানিকপুরের রাজবাড়ির একবছরের সব প্রাপ্তির চেয়েও বেশি ! জমিদারি গিয়েছে ; দেশের আইন ক্ষমাহীন হয়ে যত

প্রবলপ্রতাপ আর মহামহিমান্বিত জমিদার মহাশয়কে পুরনো আবর্জনার মত ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। সত্যিই, একটু শক্ত করে বললেও মিথ্যে বলেনি 'আগামী' নামে সোস্যালিস্ট পত্রিকাটা, যেটার ছাপার কাজের সব খরচ যোগায় দিব্যেন্দু : জমিদারেরা এখন জাদুঘরের নিদর্শন মাত্র ; এটা জাতির নবজীবনের লক্ষণ।

'আগামী' কাগজের মন্তব্য পড়ে সুরজিৎ রায় অনেকক্ষণ ধরে, যেন অপমানিত এক বিমর্ষের মত চুপ করে বসেছিলেন ; তারপরেই আস্তে আস্তে অথচ ক্ষুব্ধভাবে বলেছিলেন—কিন্তু কলকাতাতে যে অজস্র রামা-শ্যামা রাতারাতি পয়সার রাজা হয়ে উঠেছে, দশটা করে বাড়ি গড়ছে আর পাঁচটা করে গাড়ি হাঁকাচ্ছে, সেটা কোন্ জীবনের লক্ষণ ?

বাবার গম্ভীর স্বরের এই মন্তব্যও শুনতে একটুও ভাল লাগেনি সুলতার। বুঝতে পারা যায়, দিব্যেন্দুর মত কৃতী মানুষের জীবনের মধ্যে কোন গৌরব দেখতে পাচ্ছেন না সুরজিৎ রায়।

সুলতার লেখা-পড়ার আগ্রহটাকেও সুরজিৎ রায় যে খুব ভাল চোখে দেখেছেন, তা নয়। বাড়িতে থেকে বই পড়তে কোন আপত্তি নেই : কিন্তু বি-এ এম-এ পাস করবার জন্য জয়বিলাসের মেয়ের এত আগ্রহ না থাকলেও চলতো।

কিন্তু, ভাবতে গিয়ে সুলতা অদ্ভুতভাবে হেসেও ফেলেছিল। ভুলে যায়নি সুলতা, রবীন্দ্রনাথের লেখা কয়েকটা বইয়ের জন্য বাবাকে তিনবার তাগিদ দিয়েও প্রায় একটা বছর ধরে হতাশ হয়ে থাকতে হয়েছিল। সে-বই কিনে দিতে পারেন নি সুরজিৎ রায়। অথচ, কতবার গল্প করেছেন সুরজিৎ রায় ; তুই তখনও জন্মাসনি সুলতা, তোর মা-র গান শেখার জন্যে যে ওস্তাদকে রেখেছিলাম, তাকে মাসে একশো টাকা দিতাম। খাঁটি সেনী ঘরানার ওস্তাদ। এখনও মনে পড়ে ; সুখরাই টোড়ির গানটা—বাত পুরাণী। কী চমৎকার গলা ছিল ওস্তাদজীর। আর তোর মা-ও গানটা কী চমৎকার রপ্ত করেছিল।

—বেশ তো, আমার জন্য এতবড় গুণী ওস্তাদ না-ই বা আনলে, অন্তত একটা রেডিও এনে দাও। একদিন সত্যিই অভিমানিনী আদুরে মেয়েটির মত সুরজিৎ রায়ের কোলের কাছে বসে অনুরোধ করেছিল সুলতা। আর সেই মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন সুরজিৎ রায়। কোন কথাই বলতে পারেন নি।

তাই, ভাবতে গিয়ে দুঃসহ একটা অস্বস্তির ব্যথাও সহ্য করে সুলতা। মেয়েকে একটা রেডিও কিনে দেবার সামর্থ্যও হারিয়েছে যে রাজবাড়ি, তার মন দিব্যেন্দুর মত মানুষকে এ-বাড়ির অদৃষ্টে আশাতিরিক্ত উপহার বলে স্বীকার করতে পারছে না, কী অদ্ভুত মন!

কিন্তু সুলতার কাছে দিব্যেন্দু যে সব আশার তৃপ্তি। সত্যিই, দিব্যেন্দুকে স্বপ্নেরই বাঞ্ছিত বলে মনে হয়। ঠিক এইরকমটিই আশা করেছিল সুলতা।

দিব্যেন্দু যা চায়, সুলতা যে মনে-প্রাণে তাই হয়ে উঠতে চাইছে। দিব্যেন্দুর ইচ্ছা, বি-এ পাস করে নিক সুলতা। দিব্যেন্দুর ইচ্ছা, সুলতা যেন সেকেলে যত ঝকঝকে জামদানি গায়ে জড়িয়ে পুরনো জয়বিলাসের একটা খোপের মধ্যে বসে, আর যত 'রাত পুরাণী' গেয়ে গেয়ে জীবনটা শেষ না করে দেয়। জয়মঙ্গলার মন্দিরে রোজই আরতি না দেখলে সুলতার কোন ক্ষতি হবে না। সুলতা যেন বিলেতে গিয়ে একটা বছর থাকবার জন্য তৈরি হয়। যে রুচি, যে-মন, যে-হাসি আর যে-সাজ এযুগের শোভার সঙ্গে মানায়, সুলতাকে তাই পেতে হবে।

রাত দশটা বেজে গেছে বোধহয়। স্থবির জয়বিলাস একেবারে নিঝুম হয়ে গিয়েছে। নীচের হলঘরের শূন্যতাময় অন্ধকারের মধ্যে চামচিকা উড়ে বেড়ায়। মজা নদী কাঁকলির বুকের ভেতর থেকে পচা কচুরিপানার বিদ্‌ঘুটে গন্ধ বাতাসে ভেসে এসে স্তব্ধ জয়বিলাসকেও আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। শুধু অদ্ভুত একটা শব্দ শোনা যায়; বোধহয় এখনও ঘুমোতে পারেননি সুরজিৎ রায়। তাঁরই পায়ের শব্দ বারান্দার উপর আনাগোনা করছে।

কিন্তু সুলতার চোখ দুটো যেন স্বপ্নময়; ভালবাসার আশ্বাসে স্নিগ্ধ। পড়তে বসেও আনমনার মত আলোর দিকে তাকিয়ে থাকে সুলতা।

হাতের কাছে এক গাদা বই, কিন্তু একটা চিঠিও পড়ে আছে। দিব্যেন্দুর লেখা শেষ চিঠিটা, যে চিঠিতে আবার অনুরোধ করেছে দিব্যেন্দু—তুমি সত্যিই বি-এ পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরি হচ্ছো কিনা, সে-কথা আমাকে জানাওনি। আশা করি, তৈরি হচ্ছো।

ব্যস্তভাবে, যেন আনমনা ভাবনার আবেশ থেকে মনটাকে হঠাৎ মুক্ত করে নিয়ে এইবার হাতের কাছের বইগুলির দিকে তাকায় সুলতা।

কিন্তু চোখ দুটো যেন একটা আঘাত পেয়ে চমকে ওঠে। মরক্কো বাঁধাই এক সেট শেক্সপীয়র, বইগুলিকে এখানে কখন এনে রেখে দিয়ে গেছে চাকরটা?

বিশ্রী রকমের অস্বস্তি। যত ওথেলো ম্যাকবেথ আর হ্যামলেট যেন আজকের একটা বাজে ঘটনার কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। খুব আশা নিয়ে কোথাকার একটা লোক বইগুলি কিনবে বলে দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে ধর্ণা দিয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে আর অভদ্রের মত ঝগড়া করে চলে গিয়েছে লোকটা।

কী আশ্চর্য, কী দুঃসাহস, লোকটা দয়া দেখিয়েছিল। দয়ালুতার সেই মানুষটার চেহারাটাও পাশের ঘরের ভিতর থেকে হঠাৎ একবার চোখে পড়েছিল সুলতার। আধময়লা টুইলের কামিজ আর ধুতি, আর কেমন যেন শক্ত-পোক্ত চেহারাটা, যদিও মুখটা নিতান্ত ছেলেমানুষের মুখের মত কাঁচা মুখ। মনে পড়ে সুলতার, লোকটাও যেন ভয়ে-ভয়ে, কেমন আশ্চর্য হয়ে ঘরের ভিতরের দিকে তাকিয়েছিল। সুলতাকে দেখতে পেয়েছিল নিশ্চয়। আর, সেই জন্যেই বোধহয় দয়া করে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বই কিনতে চেয়েছিল।

ভালই হয়েছে, লোকটার সেই ভীরু লোভের চাহনি, সেই মতলবের দয়ালুতা জব্দ হয়েছে।

লোকটা সাপের মত ফোঁস করে উঠতেও জানে। তেজ দেখিয়ে আর কি-রকম অহঙ্কারের ভঙ্গী করে লোকটা বাবাকে অভদ্র ভাষায় কথা শুনিয়ে দিয়ে চলে গেল? কিসের অহঙ্কার? পুরনো জয়বিলাস রিক্ত হয়ে গেলেও তার একটা থামের কাছে লোকটা যে ক্ষুদ্র একটা ছায়ার মত। কথাটা মিথ্যে নয়, হাতি যদি গর্তে পড়ে, চামচিকাতেও তাকে ঠোকর মারে। রায়মানিকপুরের পুরনো রাজবাড়ির অদৃষ্টটা ঐ গর্তে-পড়া হাতিটার মত, তাই চামচিকারাও সাহস পেয়েছে। তা না হলে, ওরকম মানুষের সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বলাও জয়বিলাসের সম্মানে পোষায় না। অথচ লোকটাকে অনেক খাতির করে খাবার খাওয়ানো হয়েছে। লোকটার সঙ্গে এক ঘণ্টা ধরে গল্প করেছেন সুরজিৎ রায়। খুব ভুল হয়েছিল। অভাবের চাপে পড়ে সুরজিৎ রায়ও যেন মানুষ চিনতে ভুলে গিয়েছিলেন।

কিন্তু···কি-যেন মনে পড়ে যায় সুলতার, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনের একটা লজ্জার কাছেই ধরা পড়ে যায় সুলতা। বাবা যদি পাল্টা প্রশ্ন করেন, আমি না হয় কোন দুর্বলতার ভুলে লোকটাকে অনর্থক বেশি খাতির করে ফেলেছিলাম, কিন্তু তুমিই বা কি কম কাণ্ড করেছ? লোকটাকে যে সিঙ্গাড়া খেতে দেওয়া হলো, সেটা যে তোমারই নিজের হাতের কারিগরির সৃষ্টি। আনারসটাকে অমন কায়দা করে কেটে কেটে ডিসের উপর সাজিয়ে দিয়েছিল কে? তুমিই না?

নিজেরই মনের লজ্জার কাছে সুলতার যুক্তি বুদ্ধি জব্দ হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারা যায় না, মনেও করতে পারে না সুলতা, কি-জন্যে অচেনা এক ভদ্রলোকের সমাদরের জন্য এত আগ্রহের একটা কাজ করে ফেলেছে সুলতা।

শুধু এইটুকু মনে পড়ে, এক ভদ্রলোক শুধু এক সেট শেক্সপীয়র কেনবার জন্যে কলকাতা থেকে এতদূরে এসেছেন, জানতে পেরে ভালই লেগেছিল সুলতার। বইগুলো বিক্রি করা হবে না, ভদ্রলোককে আশাভঙ্গ হয়ে ফিরে যেতে হবে, একথা ভেবেও বেশ একটু অস্বস্তি

হয়েছিল বৈকি। আর ভদ্রলোকের মুখটা হঠাৎ চোখে পড়তেই মনে হয়েছিল, সত্যিই বড় অন্যায় করা হলো।

যাক্, যা হবার তা হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু বইয়ের পাতা উলটিয়ে, খাতা টেনে টেনে, আর পেন খুঁজে খুঁজে অনেক সময় পার হয়ে গেলেও পড়ার মনটাকে যে পাওয়া যাচ্ছে না; যেন একটা চাপা আতঙ্কের যন্ত্রণায় ছটফট করে ওঠে সুলতা। বাধা দিচ্ছে এই এক সেট শেক্সপীয়র। বইগুলি যেন এরই মধ্যে ইতিহাসের বস্তু হয়ে গিয়েছে। বইগুলো যেন সুলতার একটা অকারণ জেদকে নীরবে ধিক্কার দিচ্ছে। সুলতার বি-এ পরীক্ষার জন্য বইগুলির এমন কোন মস্তরকমের দরকার ছিল না। ঐ ভদ্রলোকেরই বোধহয় খুব দরকার ছিল।

বারান্দা থেকে সুরজিৎ রায়ের গলার স্বর যেন এই নিঝুম রাতের একটা অশরীরী কণ্ঠস্বরের মত বেজে ওঠে—এবার শুয়ে পড় সুলতা। অনেক রাত হয়েছে।

আলো নিভিয়ে দেয় সুলতা।

তিন

পরীক্ষার দিন এগিয়ে আসছে। সত্যিই তো, এই বি-এ পরীক্ষাকে যে জীবনেরই একটা পরীক্ষা বলে মনে হয় সুলতার। সেজমামী বলেছেন, পরীক্ষার ফল বের হবার পর দিব্যেন্দু বোধহয় আর দুটো মাস অপেক্ষা করতে রাজী হবে।

দিব্যেন্দুর এই অদ্ভুত ধৈর্যের মনটাকে ভাবতে ভাল লাগে।

দিব্যেন্দুর দাবি যেন একটুও ব্যস্ত না হয়ে ভালবাসার মানুষকে আপন করে নেবার জন্য শান্ত প্রতীক্ষায় বসে আছে। সুলতা কিন্তু মনে মনে স্বীকার না করে পারে না যে, এই পরীক্ষার দুয়ারটুকু পার হবার জন্য বড় বেশী ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সুলতার প্রাণ। তবু সুলতা তার আশার দাবিটাকে শান্ত করে রেখে ভাবতে পেরেছে, হ্যাঁ, পরীক্ষাটা পাস না করা পর্যন্ত দিব্যেন্দুর শেষ চিঠির উত্তর না দেওয়াই উচিত।

সকাল আর বিকেল, দুপুর আর সন্ধ্যা, তারপর প্রায় মাঝ রাত, পড়ে পড়ে প্রাণটা ক্লান্ত হয়ে উঠলেও জোর করে সেই ক্লান্তিকেই ঠেলে সরিয়ে দেয় সুলতা। ভোর হবারও আগে, যখন জয়বিলাসের দেবদারুর পাতার আড়াল থেকে ঘুম-ভাঙা কোকিলের ডাক শেষ-রাতের বাতাস মিষ্টি করে দেয়, তখন ঘুমে জড়ানো চোখের ক্লান্তি জোর করে সরিয়ে দিয়ে উঠে পড়ে সুলতা। আলো জ্বালে, বই পড়ে।

মাঝে মাঝে দিব্যেন্দুর চিঠিগুলিও পড়তে হয়। খুব বেশি নয়। এই এক বছরের মধ্যে সবশুদ্ধ তিনটি চিঠি লিখেছে দিব্যেন্দু। তিনবার দেখা হবার পর তিনটে চিঠি। চিঠির ভাষার মধ্যেও চমৎকার ভদ্রতা। ভালবেসেও কত সাবধানে কথা লিখতে পারে দিব্যেন্দু। যে-কথা আজই বলে ফেলা উচিত নয়, সে-কথা কোনদিনও মনের কোনও ভুলেও বলে ফেলেনি দিব্যেন্দু। অথচ কত স্পষ্ট করে কাজের কথা বলতে পারে। সেজমামার বাড়িতে যতবার দিব্যেন্দুর সঙ্গে সুলতার মুখোমুখি দেখা হয়েছে, ততবার নানাকথার মধ্যে শুধু একটি অন্তরের কথা বলেছে দিব্যেন্দু—ভাল করে পাস করা চাই।

সুলতার সুন্দর মুখ হঠাৎ লজ্জায় লালচে হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সে-জন্য দিব্যেন্দুর চোখের দৃষ্টি একটুও বিচলিত হয়নি, বিস্মিতও হয়নি; দিব্যেন্দু আবার এই পরীক্ষারই কথা বলেছে—আর বেশিদিন তো বাকি নেই; এখন এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে শুধু পড়াশোনা করাই ভাল।

সেজমামী কতবার কথায় কথায় বলেছেন, তারপর চিঠিতেও

লিখেছেন, সত্যিই তোমার ওপর তোমাদের দেবী জয়মঙ্গলার বিশেষ কৃপা আছে। তা না হলে তোমার এমন সৌভাগ্য সম্ভবই হতো না। দিব্যেন্দু মিত্র তোমাকে বিয়ে করতে চায়; সুরজিৎদারও বোঝা উচিত, এটা তাঁর কত বড় সৌভাগ্য। দিব্যেন্দুর দাবিটাও কত সামান্য, আর দাবিটাও তোমারই সম্মানের জন্য। তাই বলি, খুব মন দিয়ে পড়াশোনা কর, যেন ভাল করে পাস করতে পার।

দিব্যেন্দুর এই সামান্য দাবির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার জন্যই সুলতাকে বি-এ পাস করতে হবে; দাবিটা সুলতার জীবনে যেন একটা ব্রত এনে দিয়েছে। মন লাগিয়ে দিনরাত পড়াশোনা করবার ব্রত।

সবই ভাল ছিল। সুলতার ভালবাসার জীবনের এই ব্রতে কোন বাধাও কোনদিন দেখা দেয় নি। কিন্তু ··ভাবতে গিয়ে একটা বাধাকে যেন চোখেই দেখতে পায় সুলতা; আর দুঃসহ একটা অস্বস্তির উপদ্রবে মনটা যেন ছটফটও করে ওঠে। অকারণে, শুধু কয়েকটা বই-এর জন্য এক ভদ্রলোককে অপমান করা হয়েছে। মরক্কো বাঁধাই এই পুরনো বইগুলি যেন সুলতার মনের শান্তি নষ্ট করে সে অপমানের প্রতিশোধ তুলছে।

মাঝে একদিন শুনতেও পেয়েছে সুলতা, বেশ বিমর্ষ স্বরে মা'র সঙ্গে কথা বলছেন বাবা আরও খারাপ লাগছে কেন, জান? যতগুলো লোক এসেছিল, তাদের মধ্যে ঐ ছেলেটি ছিল ভদ্রলোক।

প্রভাময়ী—হতে পারে।

সুরজিৎ রায়—হতে পারে নয়। আমি দেখেছি; আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছেলেটি কি-যেন ভাবছিল, আর, নীলামের কাণ্ডকারখানা দেখে যেন বেশ একটু দুঃখিতও হয়েছিল।

প্রভাময়ী—দুঃখিত হবে কেন?

—মনে হচ্ছে, আমার অবস্থার দুঃখটাকেই বুঝতে পেরেছিল ছেলেটি।

—কেমন করে বুঝলে?

—ছেলেটিই তো দৌড়ে গিয়ে কলকাতার বাবুটিকে অনুরোধ করলো, গালিচাটাকে যেন পা দিয়ে ঠেলাঠেলি না করা হয়।

প্রভাময়ীর গলার স্বরও কেঁপে ওঠে—কী সুন্দর ছেলে!

—আরও একটা কথা···

—কি?

—আমার মনে হলো, রোশনলালের গল্প শুনে ছেলেটির চোখ দুটো ছলছল করে উঠেছিল।

—খুব নরম মনের মানুষ বলে মনে হয়।

—হ্যাঁ, তাই মনে হয়। কিন্তু···।

—কি?

—সুলতার একটা জেদের জন্যে বেচারাকে মিছিমিছি অপমান করা হলো।

—জেদ হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয়, সুলতারও ছেলেটিকে অপমান করবার কোন ইচ্ছে ছিল না।

—জানি না।

—আমি জানি। সুলতা যখন শুনলো যে এক ভদ্রলোক বই কেনবার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে আছে, তখন নিজেই···

—কি?

—সুলতা নিজেই খাবার-টাবার তৈরি করে বাইরে পাঠিয়ে দিলো।

—তাহলে বল, সুলতাই আগে দয়া দেখিয়েছে।

প্রভাময়ী হাসেন—হতে পারে।

সুরজিৎ রায় কেমন যেন শুকনো স্বরে কথা বলেন—কোন দরকার ছিল না। উচিতও নয়।

—কেন?

—কলকাতা থেকে তোমাদের সেজ-বউ মহাশয়ার চিঠি পড়নি?

—পড়েছি।

—তবে বুঝতে পার না কেন?

আর সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি সুলতা। আর কিছু শুনতে না পাওয়াই ভাল। সুরজিৎ রায়ের কথার ইঙ্গিতটা বুঝতে কোন অসুবিধে ছিল না। সুরজিৎ রায় যেন তাঁর মেয়ের জীবনের সবচেয়ে বড় সাধের ব্রতটারই একটা ত্রুটি ধরেছেন। যে-মেয়ে দিব্যেন্দুকে ভালবাসে, সে-মেয়ে একজন অপরিচিত যুবকের উদ্দেশে আড়াল থেকে এত ভদ্রতার উপহার পাঠাতে ব্যস্ত হয় কেন?

সুরজিৎ রায়ের ধারণা আর কথাগুলির উপর রাগ হলেও নিজের কাছে স্বীকার না করে পারে না সুলতা, সত্যিই অকারণে একটু বেশি ভদ্রতা করা হয়েছিল। এই ভদ্রতা করবার ইচ্ছাটাই বা কেন হঠাৎ মনের ভেতর এত ছটফট করে উঠেছিল, সেটা বোধহয় সুরজিৎ রায় জানেন না। জানলে বোধহয় আরও আশ্চর্য হয়ে প্রভাময়ীর কাছে বলে ফেলতেন— খুব ভুল করেছে সুলতা। একজন অপরিচিতের শুধু মুখ দেখেই তার উপর এত শ্রদ্ধা হয়ে যাওয়া ঠিক নয়। অন্তত সুলতার পক্ষে উচিত নয়।

এই ঘটনাটা নিতান্ত আকস্মিক ব্যাপার। চাকর রামশরণ ভুল করে একটা খবর দিয়েছিল, আপনাদেরই কোন আপন লোক এসেছেন দিদিমণি।

সেই নীলামের দিনের বিকেল বেলার ঘটনা। অপরিচিত এক যুবক ভদ্রলোক নীলামের শোরগোলের মধ্যে না থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। ভদ্রলোক কোন হাঁকডাক করেনি। বরং, মাঝে মাঝে সুরজিৎ রায়ের পাশে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে আনমনার মত ভাবছিল। চাকর রামশরণের পক্ষে ধারণা করা খুবই স্বাভাবিক, কোন আপন-লোক এসেছেন।

হলঘরের পাশের ঘরে এসে দরজার কপাট একটু ফাঁক করে সুলতা তাই একবার দেখতে আর বুঝতে চেষ্টা করেছিল, কে সেই আপন-লোকটি?

বিশ্বাস হয় না, ভদ্রলোকের শুধু মুখ দেখেই ভদ্রলোকের উপর

একটা ভক্তিভাব এসেছিল। মুখ দেখে শুধু এইটুকুই মনে হয়েছিল যে, ভদ্রলোক বোধহয় না খেয়ে চলে এসেছেন। মুখটা বেশ শুকিয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া, দুপুর পার হয়ে বিকেল হয়ে এসেছে, ক্ষিদে পাওয়ারই কথা।

কিন্তু মিথ্যে নয়, ভদ্রলোককে দেখে সত্যিই এই বাড়ির কোন আপন-জনেরই মত মনে হয়েছিল। সুরজিৎ রায়ের প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে-ছিলেন ভদ্রলোক; বাইরের মানুষও দেখলে তখনি ধারণা করে ফেলতো, বৃদ্ধ সুরজিৎ রায়ের সঙ্গে তাঁরই কোন নিজের-জন দাঁড়িয়ে আছে।

নীলামের শোরগোল ও হাঁকডাকের মধ্যে একটা অদ্ভুত কথার শব্দ শুনে একবার হেসেও ফেলেছিল সুলতা। বোধহয় মারোয়াড়ী ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠেছেন—আপনার ছেলেকে একবার এদিকে আসতে বলুন।

ছেলে আবার কে? শুনতে পেয়েছিল সুলতা, সুরজিৎ রায় হেসে হেসে বলছেন—হ্যাঁ, যাচ্ছি; কিন্তু ইনি আমার ছেলে নন।

মারোয়াড়ী ভদ্রলোকও হেসেছিলেন। কিন্তু দরজার কপাটের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেয়েছিল সুলতা, সেই যুবক ভদ্রলোক খুবই গম্ভীর হয়ে আর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। এত বড় হাসির কথাটা শুনেও যেন শুনতে পান নি।

যে চিন্তাগুলি সুলতার পড়াশোনার মন আর সেই মনের নিষ্ঠাটাকে বার বার বাধা দিয়েছে, সুলতার ঘুমের শান্তিকেও মাঝে মাঝে নষ্ট করেছে, সেই চিন্তাগুলিকেও ক্ষমা করতে পারে না সুলতা। সামান্য একটা ঘটনার জন্য এ কী শাস্তি? কোথাকার কে একজন, তার জন্যে জয়বিলাসের বাপ আর মা-ও মিছিমিছি কত কী না ভেবেছেন আর আলোচনা করছেন।

মরক্কো বাঁধাই এক সেট শেক্সপীয়র, তুলে নিয়ে চোখের আড়াল থেকে অনেক দূরে, অন্য একটা ঘরের ভিতরে রেখে দিতে দেরি করেনি সুলতা।

তার পর, পরীক্ষার দিনটাও এসে পড়তে দেরি করে না।

চার

আবার কলকাতাতে সেজমামীর বাড়িতে এসে উঠতে হয়। পরীক্ষাও দিতে হয়। কিন্তু…।

পরীক্ষার প্রথম দিনেই সুলতার চোখ দুটো যেন একটা অভিশাপের মূর্তি দেখে ভয় পাওয়া মানুষের চোখের মত চমকে ওঠে। পরীক্ষা-কেন্দ্রের ঘরের ভিতরে গার্ড হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এক ভদ্রলোক। সত্যিই যে সেই ভদ্রলোক।

ভদ্রলোক যদি সুলতার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে ওভাবে আশ্চর্য হয়ে থমকে না যেতেন, তবে বোধহয় সুলতার অস্বস্তির জ্বালাটা একটু কম হতো। কিন্তু, না, অভিশাপের শাস্তি যেন পূর্ণ হয়েছে। মনে হচ্ছে, ভদ্রলোকও সুলতাকে চিনতে পেরেছেন। তা না হলে, এত আশ্চর্য হয়ে এতক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকবেন কেন?

চিনতে পারা আশ্চর্য নয়। ভুলে যায় নি সুলতা, সেদিনের সেই সন্ধ্যায়, দরজার কপাট যখন খুলে গিয়েছিল, তখন ভদ্রলোক একবার তাকিয়েছিলেন। সুলতার চোখ দুটো খুবই স্পষ্ট করে ভদ্রলোকের সেই দু'চোখের একটা বিস্ময়ের চাহনিকেও দেখতে পেয়েছিল।

কিন্তু সে তো বলতে গেলে মুহূর্তের দেখা। ভদ্রলোকের চোখে কি সেই মুহূর্তের ছবি এখনও লেগে আছে? তা না হলে ওভাবে তাকিয়ে দেখবেন কেন?

ছাই পরীক্ষা। ইচ্ছে হয় সুলতার, এই মুহূর্তে ঘর ছেড়ে চলে যেতে। এই পরীক্ষার অভিশাপকে এখানেই স্তব্ধ করে দিতে।

ভদ্রলোক ওদিকেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সুলতার ডেস্কের ধারে-কাছেও আসেন না। কিন্তু তাতেই বা স্বস্তি কোথায়? লোকটা যেন ধূর্ত এক বিদ্রূপের মত, একটা প্রতিশোধের মূর্তির মত সুলতার মনের শাস্তি চুরমার করে দিয়ে মনের সুখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

তবু, নিজেরই মনের জোরে, আর যেন এক পাল্টা প্রতিশোধের জেদ নিয়ে পরীক্ষার খাতায় সব প্রশ্নেরই উত্তর লিখতে পারে সুলতা।

যে-ক'দিন পরীক্ষা ছিল, সে-ক'দিনও যেন একটা জেদের ব্রত পালন করে সুলতা। ঠিক সময়েই পরীক্ষার কেন্দ্রে হাজির হতে পারে। সেই গার্ড ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকাবারও কোন দরকার হয় না, তাকায়ও না সুলতা।

পরীক্ষা যেদিন শেষ হয়, সেদিন সেজমামী জিজ্ঞাসা করেন—কেমন পরীক্ষা হলো?

সুলতা উত্তর দেয়—ভাল।

কিন্তু দু'মাস পরে, রায়মানিকপুরের রাজবাড়ি জয়বিলাসের দেবদারুর ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে, আর পিয়নের হাত থেকে কলকাতার সেজমামীর চিঠিটা নিয়ে পড়ে ফেলবার পর সুলতার চোখ দুটো যেন স্তব্ধ হয়ে একটা অভিশাপময় বিদ্রূপের জ্বালা সহ্য করতে থাকে। সেজমামী লিখেছেন, সুলতা পাস করতে পারেনি।

খবর শুনে শুধু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন সুরজিৎ রায়। একটি কথাও বলেন নি। প্রভাময়ী কিন্তু আক্ষেপ করেছিলেন—মিছিমিছি এত কাণ্ড করবার পর...

কথাটা শেষ করেন নি প্রভাময়ী, তাই বুঝতে পারে না সুলতা, কি বলতে চাইছেন মা। মিছিমিছি কি করা হলো? কাণ্ডই বা কিসের?

ঘরের ভিতরে ঢুকে দিব্যেন্দুর তিনটে চিঠিকেই কিন্তু আঁকড়ে ধরেছিল সুলতা। সুলতার জীবনে ভালবাসার প্রতিশ্রুতির তিনটি চিঠি। সুলতার চোখ জলে ভরে যায়। পরীক্ষায় ফেল করেছে

সুলতা, সেই জন্যে বোধহয় নয়। দিব্যেন্দু কত দুঃখিত হবে, সেই কথা ভেবে। সত্যি কথা, বি-এ পরীক্ষায় পাস করবার জন্য, কিংবা শেক্সপীয়র পড়ে ইংরেজীতে ভাল নম্বর নেবার জন্য সুলতার মন যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, সেটা দিব্যেন্দুর মনের মত মানুষ হয়ে ওঠবার জন্যেই সুলতার জীবনের ব্যস্ততা। তা না হলে এসবের কোন দরকারই ছিল না।

বোধহয় নিজেকেই সান্ত্বনা দিতে চায়, তাই দিব্যেন্দুর কাছে চিঠি লেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে সুলতা। কি আর লিখতে হবে? শুধু লিখতে হবে, আপনি দুঃখিত হননি, শুধু এটুকু জানতে পেলেই আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো। তা না হলে—।

—সুলতা!

ডাকছেন সুরজিৎ রায়। প্রভাময়ীও ডাকলেন -এদিকে এসে একটা কথা শুনে যা।

দেখে আশ্চর্য হয় সুলতা; বাবা আর মা'র মুখের গম্ভীর ভাবটা একটুও দুঃখের ভাব নয়।

সুরজিৎ রায় বলেন—যাক্, বি-এ পরীক্ষার পরিণাম তো দেখাই গেল। এখন বোধহয় বইগুলো বিক্রি করে দিতে পারা যায়?

সুলতার চোখে-মুখে যেন একটা যন্ত্রণাক্ত ছায়া ছটফট করে ওঠে।

—একথা আমাকে জিজ্ঞেস করবার কোন দরকার হয় না।

—দরকার হয়; যদি আবার পরীক্ষা দেবার ইচ্ছে থাকে।

—না, ইচ্ছে নেই।

—তবে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দিই?

—দাও।

হ্যাঁ, আবার জয়বিলাসের ধুলোমাখা কিছু পুরনো ঐশ্বর্যের আসবাব বিক্রি করবার দরকার হয়েছে। দেনা শোধ করতেই আগের বিক্রির প্রায় সব টাকা ফুরিয়ে গিয়েছে। রাজবাড়ির পুরনো হেঁসেলের যত ভারিক্কি তৈজস, গোটা পঞ্চাশ রুপোর গোলাপপাশ আর আতরদান,

থিয়েটারী স্টেজের একগাদা উপকরণ—মখমলের পোশাক, রেশমী সীন আর সোনার গিল্‌টি করা একটা পিতলের সিংহাসন, চন্দনকাঠের একটা চার হাত উঁচু প্যাগোডা, আর এক আলমারি-ভর্তি যত আইভরির পুতুল। এবং সেই সঙ্গে মরক্কো বাঁধাই এক সেট শেক্সপীয়র।

পাঁচ

জয়বিলাসের বিরাট বারান্দার সামনে দেবদারুর ছায়া আর কাঁকরের উপর আবার ক্রেতা মানুষের ভীড়।

ভিড় বলতে দশ-বার জন গাড়িওয়ালা মানুষের সমাবেশ। সবই কলকাতার গাড়ি। সুরজিৎ রায় এবার একটু আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকেন, বোধহয় বুঝতে পারেন না, পুরনো জয়বিলাসের যত সেকেলে সম্পদের এইসব ছিটেফোঁটা কেনবার জন্য একালের কলকাতার মানুষের মনে এত ইচ্ছা আর চেষ্টা কেমন করে সম্ভব হয়?

প্রভাময়ীর কাছে গল্প বলেন সুরজিৎ রায়।—আগে বিশ্বাস করিনি, পরে একদিন নিজের চোখে দেখতে পেয়ে বিশ্বাস করতে হলো।

—কি?

—সেবার গিয়েছিলাম নেপাল-তরাইয়ে শিকার করতে। জঙ্গলের একজায়গায় গাছের মাথার উপর শকুনের দল দেখে সন্দেহ হলো, নিকটে কোথাও মড়ি আছে। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, ঠিকই, মড়ি বটে, কিন্তু সেটা একটা বুড়ো বাঘের লাস, আধ-খাওয়া অবস্থায় পড়ে আছে। গাছের উপর মাচান বেঁধে বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করবার পর দেখতে পাওয়া গেল, ঠিকই, যা সন্দেহ করেছিলাম, তাই ঠিক।

—কি ?

—একটা জোয়ান বাঘই বুড়ো বাঘটাকে মেরেছে আর খেয়েছে। নিজের চোখেই দেখেছিলাম প্রভা, জোয়ান বাঘটা গুটি মেরে এগিয়ে এসে বুড়ো বাঘের লাসের পচা মাংস খাবলে খাবলে খাচ্ছে।

এই গল্প শুনেও প্রভাময়ী ঠিক বুঝতে পারেন না, কী বোঝাতে চাইছেন সুরজিৎ রায়, রায়মানিকপুরের পুরনো রাজবাড়ি জয়বিলাসের অধিস্বামী, যাঁকে রাজা সুরজিৎ রায় বলে ডাকবার মত অনেক মানুষ চারদিকের দশটা গাঁয়ে আজও আছে।

সুরজিৎ রায় এবার খোলা ভাষায় বুঝিয়ে দেন।—এই যে কলকাতার পয়সাওয়ালা মানুষগুলি আমার জয়বিলাসের পুরনো আসবাব কেনবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসে, দেখে আমার মনে হয়, ওরাও ঠিক সেই জোয়ান বাঘটার জাত, এক বুড়ো বাঘের মাংস খাবার জন্যে —।

বলতে বলতে কাঁপতে শুরু করেন সুরজিৎ রায়। প্রভাময়ী করুণভাবে তাকিয়েও বেশ একটু বিরক্ত স্বরে বলেন—থাক। ওসব কথা ছেড়ে দাও।

এ ধরনের গল্পগুলি সুলতাও মাঝে মাঝে শুনতে পায়। শুনতে পেয়ে সুলতার মন বোধহয় আরও বেশি বিরক্ত হয়। মনেও পড়ে যায়, একদিন সেজমামার সঙ্গে কথায় কথায় কি-কথা বলেছিল দিব্যেন্দু।

সেজমামা একটু দুঃখ করে বলেছিলেন - সুরজিৎদার ভাগ্যের কাণ্ড দেখে সত্যিই একটু দুঃখ হয়। কী ছিলেন আর কী হয়েছেন ? আমিও তো দেখেছি, সুরজিৎদার ছোট বোন প্রতিভার বিয়ের সময় দুই হাতির পিঠে চাপিয়ে তত্ত্ব পাঠানো হয়েছিল। রায়মানিকপুর থেকে মানভূমের বীরপুর, কম করে দু'শো আশি মাইল। বীরপুর রাজ এস্টেটের দেওয়ানজি বলেছিলেন—বীরপুর রাজবাড়ির মত এমন রহিস কুটুম দ্বিতীয় কেউ নেই। সুরজিৎদার দুই হাতি, মধু আর যদুকে রুপোর টায়রা বকসিস দিয়েছিলেন প্রতিভার শ্বশুর।

দিব্যেন্দু হেসে ফেলেছিল—কোথায় গেল সেই দুই হাতি ?

সেজমামা—সেই কথাই তো বলছি। কালস্রোতে কোথায় যেন ভেসে গেল।

দিব্যেন্দু—ওসব ফিউড্যাল আবর্জনা কালস্রোতে ভেসে যাবেই, কেউ রোধ করতে পারে না। যা হওয়া উচিত, তাই হয়েছে।

সেজমামা বিমর্ষভাবে বলেন—তাই বোধহয়।

সুলতাও অবিশ্বাস করতে পারেনি। আর দিব্যেন্দুর মুখের এই অবাধ স্পষ্টভাষিতা, জয়বিলাসের অদৃষ্টের জীর্ণতাকে ঠাট্টা করে শোনানো এই ধরনের কথাগুলি শুনতে খারাপও লাগেনি। বড় জোর বলা যায়, একটা অপ্রিয় সত্যের কথাকে হেসে হেসে আর স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে দিব্যেন্দু ; কিন্তু একটুও মিথ্যে বলেনি।

জয়বিলাসের এই বেদনাময় পরিণামের জন্য দিব্যেন্দুর মনে যে কোনই সমবেদনা নেই, তা'ও সত্য নয়। দিব্যেন্দু বলে—জমিদারী প্রথাটাই তো একটা নির্মম অন্যায়ের প্রথা। মানুষকে শোষণ করে যত কঠিন মার্বেলের প্যালেস তৈরি হোক না কেন, সেটা ভেঙ্গে যাবেই, যাওয়াই উচিত। জমিদারদের অবস্থা খারাপ হয়ে গেল, এটা তাঁদের পক্ষে কষ্টের ব্যাপার হলেও তাঁদের মঙ্গলেরও ব্যাপার। প্রজাকে শুষে রাজভোগ খাবার পাপ থেকে তাঁরা বেঁচে গেলেন।

কথাটা শুনতে পেলে আজ স্বয়ং সুরজিৎ রায়ও কি অস্বীকার করতে পারবেন ? নিশ্চয় এরই মধ্যে ভুলে যেতে পারেননি সুরজিৎ রায়। সুলতাও সে-গল্প সেজমামীর কাছে শুনেছে। জয়বিলাসের পূব বাগানের ভিতরে এখন যে পাকা ঘরটার সব দেয়াল চিড় খেয়ে ফেটে গিয়েছে আর বটের চারায় ছেয়ে গিয়েছে, সেই ঘরটার নাম জব্দঘর। সুরজিৎ রায়ের পালকি বইতে অস্বীকার করেছিল লেঠেলপাড়ার এক বুড়ো সর্দারের দুই ছেলে। সুরজিৎ রায় সেই দুই বিদ্রোহীকে চাবুক মেরে ঘায়েল করে ঐ জব্দঘরের ভিতরে ফেলে রেখে দিয়েছিলেন।

তিন দিনের মধ্যে এক মুঠো চিঁড়েও ওদের খেতে দেওয়া হয়নি। নিউমোনিয়া হয়ে লোক দুটো মরে গিয়েছিল।

গল্প শুনে সুলতার চোখের তারা দুটো শিউরে উঠেছিল। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না, বাবার মত নরম মনের মানুষ, সুলতার জ্বরের কথা শুনলে যাঁর চোখ এই সেদিনও ছলছল করে উঠেছিল, সে মানুষের পক্ষে এমন ভয়ানক কাজ কি করে সম্ভব হয়েছিল?

সেজমামী অবশ্য বলেন—কী তেজী, আর কত সম্মানী ছিলেন সুরজিৎদা। সব সহ্য করতে পারতেন, কিন্তু অপমান সহ্য করতে পারতেন না।

কিন্তু আজ? ভাবতে গিয়ে সুলতার মন যেন ধিক্কার দিয়ে হেসে ফেলে। আজ যে একটা আধময়লা টুইলের কামিজও অনায়াসে অপমান করে চলে যায়, আর, সেই অপমানের জ্বালাটুকু বোধ করতেও পারেন না সুরজিৎ রায়।

আর কিছুক্ষণ পরেই নীলামের শোরগোলে জয়বিলাসের হলঘরের স্তব্ধতা ভেঙে যাবে। আবার হাঁক দিয়ে বাতাস কাঁপাবে যুগল সরকার। সুরজিৎ রায় আবার ফ্যালফ্যাল করে তাকাবেন। আর নীলামের শোরগোল থেমে যাবার পর কয়েক তাড়া নোট দু'হাতে আঁকড়ে ধরবেন।

কিন্তু, সেজমামীর একটা চিঠি হাতে নিয়ে নিজের ঘরের ভিতরে বসে সুলতা এই জীর্ণ দুর্বল ও অক্ষম জয়বিলাসের অদৃষ্টটাকেই যেন প্রশ্ন করে করে বিরক্ত হয়। কিন্তু সত্যিই কি একটা পিয়ানো কেনবার মত টাকা হবে?

সেজমামী লিখেছেন—তুমি পাস করতে পারনি, খবর শুনে দিব্যেন্দু দুঃখিত হয় নি। কিন্তু দিব্যেন্দুর ইচ্ছা, তুমি যেন অন্তত পিয়ানো বাজাতে শিখে ফেলতে পার। আমিও বলি, সুরজিৎদা যেন পিয়ানোটা কিনে দেন; আর তুমি কলকাতায় এসে আমার এখানে মাস তিন থেকে চৌরঙ্গীতে মিস মূলারের পিয়ানো ক্লাসে ভর্তি হয়ে…।

সেজমামীর চিঠিটা যে সত্যিই একটা সান্ত্বনা। দিব্যেন্দুর মনটা সুলতার জন্য তেমনই আশার স্বপ্ন নিয়ে অপেক্ষা করছে। সুলতার এই ক'দিনের আতঙ্কময় অশান্তিটাই মিথ্যে হয়ে গিয়েছে। অভাবে ও দীনতায় বিব্রত এক রাজবাড়ির যত মিথ্যে গৌরবের হাজতঘরের মত এই ঘরের ভিতর থেকে সুলতাকে নতুন সম্মানের জগতে নিয়ে যেতে চায় দিব্যেন্দু; তাই দিব্যেন্দুর মন এই সামান্য দাবির কথাটা জানিয়েছে। জয়বিলাসের যত সেকেলে ঐশ্বর্যের আসবাবগুলি আবর্জনা বলেই মনে করে দিব্যেন্দু, কিন্তু জয়বিলাসের মেয়েকে ভালবাসে। দিব্যেন্দুর এই ভালবাসা যে সুলতার জীবনেরই সম্মান।

নিজের কাছে নিজের বয়সের হিসেবটা অজানা নয়। সেজমামী মাঝে মাঝে খুশি হয়ে বলেন—একুশ বছর বয়সের মেয়ের চেহারা এত কাঁচা, এটা কিন্তু আমি আর কোথাও দেখিনি। রায়মানিকপুরের জল বাতাসের গুণ স্বীকার করতে হয়। কলকাতার মেয়ে হলে তোমার চেহারার কিন্তু এ-জলুস থাকতো না সুলতা, এখানে কুড়িতেই বুড়িয়ে যায়।

ভয় ছিল, বার বছর বয়সের মেয়েকে বিয়ে দেওয়া যে বংশের অভ্যাস, সে বংশের মেয়ে সুলতাকে ষোল হবার আগে পার করে দেবেন সুরজিৎ রায়। চেষ্টাও যে করেননি, তা নয়। কিন্তু সুলতারই সৌভাগ্য বলতে হবে, পছন্দমত পাত্র পান নি বলে সুরজিৎ রায়ের ইচ্ছা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে।

সেজমামী বলেন, ভালই হয়েছে। সুলতাও অস্বীকার করে না, ভালই বলতে হয়। ষোল বছর বয়সেই জয়বিলাসের মত কোন গেঁয়ো রাজবাড়ির দেউলিয়া সংসারের বধূরাণী হবার অভিশাপ থেকে জীবনটা বেঁচে গিয়েছে।

শোরগোল শোনা যায়। নীলাম হাঁকতে শুরু করেছে যুগল সরকার। সুরজিৎ রায় চুপ করে হলঘরের এক দিকে একঠাঁই দাঁড়িয়ে আছেন। প্রভাময়ীও চুপ করে হলঘরের পাশের ঘরে একটি চেয়ারের উপর চুপ করে বসে থাকেন।

দু'ঘন্টার বেশি সময় লাগলো না। জয়বিলাসের সেকেলে ঐশ্বর্যের যত ধুলোমাখা অবশেষের একটা স্তূপ সত্যিই বিক্রি হয়ে গেল। ক্রেতারা বললেন—এবারের নীলামের লটও নেহাৎ মন্দ নয়। কিছু ভাল মাল পাওয়া গেল।

ট্রাক এলো। পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রি হয়ে জয়বিলাসের বুকের ভিতরের পুরনো রক্তমাংসের একটা লট কলকাতায় চলে গেল। যুগল সরকারের কমিশন মিটিয়ে দিয়ে যখন বাড়ির ভিতরে ঢুকলেন সুরজিৎ রায়, তখন···।

কি আশ্চর্য, সুলতা তখন একটা কাঠের বারকোশে খাবার সাজিয়ে ফেলেছে। কাপ-ভর্তি চায়ের উপর আরও এক-চামচ চিনি ঢেলে দিয়ে অদ্ভুতভাবে সুরজিৎ রায়ের মুখের দিকে তাকায় সুলতা।

সুরজিৎ রায়—এ কি? এ ব্যবস্থা কিসের জন্য?

সুলতাও যেন চমকে ওঠে আর মৃদু স্বরে বিড়বিড় করে—কেন? বাইরে খাবার পাঠাবার কি দরকার নেই?

সুরজিৎ রায়—না, কোন দরকার নেই। কে খাবে এসব খাবার?

সুলতা—কেন?

প্রভাময়ীও আশ্চর্য হন—কেন মানে কি? কার জন্যে হঠাৎ খাবার টাবার তৈরি করে বসলি?

জয়বিলাসের বাপ মা আর মেয়ে, তিন জনেরই প্রাণ যেন হঠাৎ একটা করুণ বিস্ময়ের আঘাত পেয়ে একেবারে নীরব হয়ে যায়। কেউ কথা বলে না, কেউ কথা বলবার মত কিছু খুঁজেও পায় না।

ক্লান্ত সুরজিৎ রায় আস্তে একটা হাঁপ ছেড়ে দিয়ে বলেন—সবই বিক্রি হয়ে গেল, শুধু ঐ বইগুলো ছাড়া।

প্রভাময়ী—বইগুলো কেউ কিনতে চাইলো না?

সুরজিৎ রায়—না।

প্রভাময়ী—সেই ছেলেটি কি আসে নি?

সুরজিৎ রায়—না।

কিছুক্ষণ নীরবে গম্ভীর হয়ে থেকে সুরজিৎ রায় যেন বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন—এটা আশা করাই ভুল।

প্রভাময়ী—কিন্তু তুমিই তো আশা করেছিলে যে, ছেলেটি এবারও হয়তো আসবে।

সুরজিৎ রায়—সেই কথাই বলছি, আশা করাই ভুল হয়েছে। অপমানিত হবার ভয় যেখানে আছে, সেখানে সাধ করে কেউ আসে না।

আবার কিছুক্ষণের নীরবতা। বিকালের বাতাসে দেবদারুর মাথা দুলতে শুরু করেছে। প্রভাময়ী বলেন—কলকাতা থেকে সেজবউদির চিঠি পেলাম।

সুরজিৎ রায় –কি লিখেছে?

প্রভাময়ী—এবার সুলতাকে কলকাতায় গিয়ে কিছুদিন থাকতে হয়।

—কেন?

—সুলতার জন্যে একটা জিনিসও কিনতে হয়।

—কি জিনিস?

—কত টাকা পেলে?

—যা পেয়েছি, রাম ভট্চাযের পাওনা সুদ-সুদ্ধ মিটিয়ে দেবার পরও কিছু থাকবে।

—কত?

—আটশো।

—তাতে একটা পিয়ানো কেনা চলবে?

—পিয়ানো কেন?

—দিব্যেন্দুর ইচ্ছা, সুলতার পিয়ানো শেখা চাই।

সুরজিৎ রায়ের শিথিল ভুরু দুটো যেন হঠাৎ আহত হয়ে আরও শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ে। বোধহয় একটা প্রচণ্ড আপত্তির নিঃশ্বাস জোর করে চেপে রাখতে চেষ্টা করছেন সুরজিৎ রায়।

তারপরেই গম্ভীর স্বরে বলেন—তাহলে এই আটশো টাকা কলকাতার সেজবউকে পাঠিয়ে দাও। পিয়ানো কিনে ফেলুক।

ছয়

জয়বিলাসের বাপ আর মা, দু'জনেরই কেউ আপত্তি করেন নি। সুলতার আপত্তি দূরে থাকুক, যেন একটা অসহ ব্যাকুলতাই ছিল; রায়মানিকপুরের এক রিক্ত রাজবাড়ির যত সেকেলে জীর্ণতার পরিবেশ থেকে সরে গিয়ে কলকাতায় এসে থাকবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল সুলতা। দিব্যেন্দু কবে বিলেত যাবে, সে-কথা এখনও সেজমামীর কাছে বলেনি দিব্যেন্দু। মনে হয়, দিব্যেন্দু এখনও অপেক্ষার দুঃখ সহ্য করতে চায়। বিয়ে হবে, তারপর বিলেত যাবে দিব্যেন্দু। সেজমামীরও ধারণা, বিয়েটা হয়ে যেতে এমন কিছু দেরি হবে না, যদি না, যদি তার আগে সুলতা পিয়ানোতে অন্তত কয়েকটা গৎ বাজাতে আর বাজাবার শৌখীন স্টাইলটুকু শিখে ফেলতে পারে। কোন সন্দেহ নেই, আধুনিক কালের মেয়ে হয়েও সুলতা যেন সেই পালকি-যুগের মেয়েটি হয়ে এক গেঁয়ো রাজবাড়িতে সেকেলে অভিরুচির জগতে পড়ে আছে। সুরজিৎদাও কোন চেষ্টা করেন নি, তাঁর বোধহয় এদিকে কোন নজরই ছিল না যে, শুধু একটা সুন্দর চেহারা হলেই আজকালকার দিনে কোন মেয়েকে কোন শিক্ষিত বড়মানুষের সংসার আদর করে ঘরে তুলে নেয় না।

কলকাতায় এসেছে সুলতা। সেজমামীর বাড়িতে একদিন ঘরের ভিতরে একলা বসে হঠাৎ শুনতেও পেয়েছে, বাইরের বারান্দায় সোফার উপর বসে দিব্যেন্দুর সঙ্গে কথা বলছেন সেজমামী।—পাস করতে অবশ্য পারেনি সুলতা, কিন্তু মেয়েটা লেখাপড়া বেশ ভালই শিখেছে।

দিব্যেন্দু হাসে—সেটা কি রকমের ব্যাপার?

সেজমামী—শেক্সপীয়রের সব বই পড়েছে সুলতা। আর, সে-সব বই থেকে চমৎকার আবৃত্তি করতে পারে। সুন্দর এক সেট শেক্সপীয়র পুষে রেখেছে সুলতা।

—কিন্তু তাতে লাভ কি হলো?

—কি বললে?

—আমাদের বাড়িতে, আমার তিন কাকার বাড়িতে আধখানাও বই নেই। কিন্তু বাড়ির তিন ছেলে আর পাঁচ মেয়ের সবাই গ্র্যাজুয়েট। আসল কথা হলো…।

সেজমামী যেন অনুতপ্ত হয়ে নিজের কথার ভুলটাকে সংশোধন করেন—হ্যাঁ, আমিও তাই বলছি; আসল কথা হলো পাস করা।

—যাই হোক…দিব্যেন্দুও যেন মায়াময় ভাষায় কথা বলতে চায়। …যাই হোক, পাস না করলেও যদি ভাল এটিকেট জানা থাকে, কথাবার্তায় আর ব্যবহারে কালচারের ব্রাইটনেস থাকে, তবে তাতে সব মেয়েকেই ভাল মানিয়ে যায়।

সেজমামী উৎসাহিত হয়ে বলেন—আমাদের সুলতাও ঠিক এই কথাই বলে। পিয়ানো শেখবার জন্যে কত আগ্রহ। আমার মনে হয়, শিখতে তিনটে মাসও লাগবে না, যদি কোন ভাল পিয়ানো-স্কুলে ভর্তি হয়ে…।

দিব্যেন্দু—মিস মূলারের স্কুলে বোধহয় নাচ শেখানোও হয়।

—শুনেছি।

—আমার মনে হয়, পিয়ানো শেখার সঙ্গে সঙ্গে যদি…অন্তত ওয়াল্‌জ্‌ আর পোল্‌কার স্টেপগুলি কিছুটা শিখে ফেলতে পারা যায়…।

সেজমামী বলেন—পারবে না কেন? সুলতা ইচ্ছে করলে সবই শিখে ফেলতে পারে। পাস না করুক, চেহারায় বয়সে আর শখে তো মেয়েটা জবুথবু নয়।

দিব্যেন্দু চলে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। পাশের ঘরে বসে এতক্ষণের দমবন্ধ মনটাকে এবার হাঁপ ছেড়ে যেন একটু হালকা করে দিতে পারে সুলতা। মনে হয়, ভালোই হলো, দিব্যেন্দুর সামনে গিয়ে দাঁড়াবার আর কথা বলবার জন্য ডাক দেননি সেজমামী। কিন্তু…।

ভাবতে গিয়ে যেন বুকের ভিতরের পোষা দু'বছরের আশার বাতাসটা হঠাৎ এলোমেলো হয়ে যায়। দিব্যেন্দুর শখের মনটা প্রকাণ্ড উঁচু পাহাড়; সেই পাহাড়ের ছায়া ছোট পুকুরের জলের বুকে কুলোবে না। জয়বিলাসের মেয়েকে আধুনিক শখের সাগর হতে হবে। পিয়ানো বাজিয়ে আর পোল্‌কা নেচে, এটিকেট আর কালচারের ছবিটি হয়ে, দিব্যেন্দু মিত্রের ইচ্ছার তৃপ্তিটি হয়ে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। মনে হয়, কলকাতার আধুনিক অভিরুচির দাবিটা যেন ক্ষমাহীন হয়ে প্রচণ্ড এক বরপণ দাবি করেছে। কত শান্ত, কত ব্যস্ততাহীন এই দাবি। দিব্যেন্দুর কথাগুলি কত হিসেব করা ইচ্ছার প্রতিধ্বনি। ভদ্রলোক যেন দরিদ্র জয়বিলাসের মেয়ের জীবনের উপর শর্তের পর শর্ত, আর পরীক্ষার পর পরীক্ষা চাপিয়ে দিতে চাইছেন।

সেজমামী বলেন—আমি দিব্যেন্দুর ছোটকাকার মেয়ে টুনিকে জিজ্ঞেস করেছি। পিয়ানো শেখা মানে হলো, শুধু একটা গৎ বাজাতে শেখা। সেটাও বড় কথা নয়। বাজাবার একটা স্টাইল আছে, সেটাই আসল শেখা। একটা মেমসাহেবকে শ'তিনেক টাকা দিয়ে এক মাসের মধ্যে শিখে নেওয়া যায়। পিয়ানো না কিনলেও চলবে।

সুলতা আশ্চর্য হয়—তাহলে?

সেজমামী বলেন—তাহলে টুনিদের বাড়িতে একবার চল। যে মেমসাহেবটা ওকে পিয়ানো শেখাতে আসে, তার কাছে তুমিও শেখ।

সুলতা—তার মানে…।

সেজমামী—তার মানে, একটা ব্যবস্থা করতে হয়, টুনিদের বাড়িতে গিয়ে ঐ মেমসাহেবটার কাছে অন্তত একটা মাস ছাত্রী হয়ে…।

দেরি করেন নি সেজমামী। সেদিনই সন্ধ্যাবেলা সুলতাকে সঙ্গে

নিয়ে অ্যাটর্নি যাদব মিত্রের যে বাড়ির একটি ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আর ভিতরে উঁকি দিয়ে হেসে ফেললেন, সে-বাড়িই হলো টুনিদের বাড়ি।

টুনি অর্থাৎ বাসনা মিত্র, দিব্যেন্দুরই গ্র্যাজুয়েট খুড়তুতো বোন। সেজমামীর পিছনে দাঁড়িয়ে স্থলতাও দেখতে পায়, ঘরের ভিতরে টেবিলের কাছে বসে, আর এক গাদা বই-এর স্তূপের কাছে মাথাটা নামিয়ে দিয়ে একটা খাতার উপর মন দিয়ে কি-যেন লিখছে বাসনা। আর বাসনারই সামনে, টেবিলের ওদিকে চেয়ারের উপর বসে আছেন এক ভদ্রলোক।

সেজমামী ডাকেন—বাসনা!

কিন্তু স্থলতার চোখ দুটো থরথর করে কেঁপে ওঠে। ভদ্রলোক নয়, যেন এক নিদারুণ বিদ্রূপের মূর্তি চেয়ারের উপর বসে আছে। আধময়লা টুইলের কামিজ অবশ্য নয়, কিন্তু শার্ট-ট্রাউজারও নয়। বেশ পরিচ্ছন্ন ধুতি-পাঞ্জাবির সাজে বেশ সুন্দর ও শান্তটি হয়ে বসে আছেন সেই ভদ্রলোক। চোখ দুটো যেন এক সুখের আকাশের তারার মত হেসে হেসে ঝিকঝিক করছে।

—দয়ামাসিমা! উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে হেসে ওঠে বাসনা। তারপরেই ঘর থেকে বের হয়ে এসে স্থলতার মুখের দিকে তাকায়—আপনাকেও চিনি বলে মনে হচ্ছে।

সেজমামী বলেন—চেন বৈকি: নীরুর বিয়ের সময় স্থলতাকে তুমি নিশ্চয়ই দেখেছিলে।

—আপনি স্থলতা? বাসনা যেন আরও খুশি হয়ে হাসে। কিন্তু···

—সেজমামীই প্রশ্ন করেন—কি?

বাসনা—কিন্তু দিব্যেন্দুদার কাণ্ড-কারখানা আমার একটুও ভাল লাগছে না।

সেজমামী একটু ভীতভাবে বলেন—কেন?

বাসনা—এত অপেক্ষার কি মানে হয় রে বাবা, বুঝি না।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে তাকায় সুলতা। আর মুখটাও যেন দুঃসহ একটা অস্বস্তির চাপে আরও গম্ভীর হয়ে যায়।

ভিতরের ঘরের ভিতরে এসে সেজমামীর সঙ্গে, আর গম্ভীর ও নীরব সুলতার মুখের দিকে তাকিয়ে যেন নিজের মনের আবেগে কথা বলতে থাকে বাসনা—আমার আজকাল আর কিছুই ভাল লাগে না দয়ামাসিমা, তাই বাড়ির বাইরে কোথাও যাই না। ধরুন, সেই যে প্রায় একবছর আগে আপনাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম, তারপর আর...।

সেজমামী—ছেলেটি কে, ওঘরে যাকে দেখলাম ?

বাসনা—আমার টিউটর জয়ন্তবাবু।

সেজমামী—টিউটর কেন ? তুমি কি আবার পরীক্ষা দিচ্ছো ?

—না। আর পরীক্ষা-টরীক্ষার ধার ধারি না। এবার শুধু পড়া, সত্যিকারের পড়া।

—তার মানে ?

—পাস করেও সত্যিই একটা মূর্খী হয়েছিলাম মাসিমা। কিছুই শিখিনি। এখন পাস করবার গরজে নয়, শেখবার গরজেই পড়ছি।

—তোমার পিয়ানোর টিচার সেই মেমসাহেবটি...।

খিলখিল করে হেসে ওঠে বাসনা—ওসব বাজে ঝঞ্ঝাটের পাট চুকিয়ে দিয়েছি। পিয়ানো শেখা না ছাই। পিয়ানোটাকেই বিদায় করে দিয়েছি। এই রকমটি করে ঘাড় দোলাও, ওভাবে একটু হাস, এভাবে একটু আড়চোখে তাকাও, সেভাবে হাত দোলাও, এই তো শেখা। কি দরকার বলুন ?

সেজমামী একটা আতঙ্কের ভাব নিয়ে আর বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে বাসনার চেহারাটা, আর বাসনার সাজের রকমটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। বাসনা মেয়েটা এই এক বছরের মধ্যে কেমন-যেন হয়ে গিয়েছে। সাদাসিধে ভঙ্গীতে একটা সস্তা তাঁতের শাড়ি গায়ে জড়িয়েছে বাসনা। খোঁপাটাকে যেন কোনমতে টেনেটুনে একটা টিপি বেঁধেছে। অথচ...এই তো সেই বাসনা, যার সাজ-পোশাকের

স্টাইল দেখে আর অদ্ভুত এটিকেট-দুরস্ত হাসির শব্দ শুনে নীরুর বিলেতফেরত স্বামীও ঠাট্টা করে বলেছিল, বড় বেশি মর্ডান। বণ্ড স্ট্রীটের ফ্যাশনও হার মানবে।

সেজমামী বলেন—যাই হোক, এখন আমাদের সুলতার জন্যে যে সত্যিই দরকার হয়েছে।

বাসনা—কি?

—পিয়ানো শিখতে চায় সুলতা। সেই মেমসাহেবটিকে দরকার।

বাসনা—আমি ঠিকানা দিতে পারি।

সুলতা হঠাৎ বলে ওঠে—না।

সেজমামী—কি?

সুলতা—কোন দরকার নেই।

সেজমামী অপ্রস্তুতের মত সুলতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। সুলতা বলে—এবার চল।

বাসনা অনুরোধ করে, আর একটু অপেক্ষা করুন, মা এখনই বাড়ি ফিরবেন।

সেজমামী হয়তো আরও কিছুক্ষণ থাকতেন, কিন্তু সুলতা ব্যস্তভাবে আপত্তি করে সেজমামীকে তাড়া দেয়—চল মামী।

সাত

সে ভদ্রলোকের নাম জয়ন্ত। বাসনার টিউটর জয়ন্ত।

সেজমামার বিরাট বাড়ির ভিতরে বারান্দার এক কোণে একটা মোড়ার উপর বসে আর সন্ধ্যার অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সুলতা যেন

পার্থিব জগতের একটা সুন্দর বিদ্রূপের ছবি দেখতে থাকে। বাসনার টিউটর জয়ন্তর চোখ দুটো যেন সুখী তৃপ্ত আর ধন্য দুটো চোখ। আর, বাসনার মুখের হাসিটা যেন কোন পরশমণির ছোঁয়া লাগা সোনালী হাসি। বদলে গিয়েছে বাসনা। বি-এ পাস করেও নিজেকে মূর্খী বলে মনে করেছে। পিয়ানোটাকে আবর্জনার মত ঘেন্না করে সরিয়ে দিয়েছে। সাজ-পোশাকের স্টাইল আর এটিকেটকেই তাড়া দিয়ে খেদিয়ে দিয়েছে। কিসের জন্য? কেমন করে এ অসম্ভব সম্ভব হলো? টিউটর জয়ন্তই কি বাসনার জীবনে এই জাদুর কাণ্ড ঘটিয়েছেন?

—এ কি? আপনি এখানে এভাবে অন্ধকারের মধ্যে বসে আছেন?

বারান্দার নীরবতাকে চমকে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে বাসনা। চমকে ওঠে সুলতাও।

বাসনা বলে—আমি এতক্ষণ ধরে আপনাকেই খুঁজছিলাম। আপনার কাছেই আমি এসেছি।

হাসতে চেষ্টা করে সুলতা—আমার কাছে?

বাসনা চেঁচিয়ে হেসে ওঠে—আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই, আপনারই কাছে।

—কেন বলুন?

—কি-আর বলবো! তখন আমিও কি ছাই বুঝতে পেরেছিলাম, আপনি কেন এত গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন।

—কখন্?

—আমাদের বাড়িতে। জয়ন্তবাবুকে দেখে।

—ছিঃ, একথার কোন মানে হয় না। আপনি ভুল দেখেছিলেন।

—কিন্তু জয়ন্তবাবু যে বললেন, উনি আপনাকে চেনেন।

সুইচ টিপে বারান্দার আলো জ্বালিয়ে দিয়ে সুলতার মুখের দিকে যেন অপলকভাবে তাকিয়ে থাকে বাসনা।

সুলতার চোখে যেন একটা করুণ বিস্ময়। বিড়বিড় করে সুলতা—উনি বললেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আরও অনেক কথা বললেন।

নীরব হয়ে শুধু তাকিয়ে থাকে সুলতা। চোখ দুটোও ভীরু হয়ে ওঠে। বুঝতে অসুবিধে নেই, কি-কথা বলেছেন ভদ্রলোক। রায়-মানিকপুরের এক রিক্ত নিঃস্ব রাজবাড়ির যত অসার অহঙ্কারের কথা, অভদ্রতার কথা আর একটা মানুষকে অকারণে অপমান করবার কথা।

বাসনা বলে—জয়ন্তবাবু বললেন, আপনাদের বাড়িটাকে দেখতে চমৎকার; ইতিহাসের একটা ঘুমন্ত পুরীর মত মনে হয়। জয়ন্তবাবু তো শুধু শেক্সপীয়রকে নয়, হিস্ট্রিকেও খুব ভালবাসেন।

উত্তর দেয় না সুলতা।

বাসনা বলে—আপনার বাবাকে দেখে জয়ন্তবাবুর মনে একটা অদ্ভুত শ্রদ্ধার ভাবও আকুল হয়ে উঠেছিল। আপনাদের ব্যবহারে আশ্চর্য হয়েছিলেন জয়ন্তবাবু। অচেনা অজানা একটা মানুষকে নিকট আত্মীয়ের মত মনে করে খাবার খাইয়েছিলেন আপনারা।

সুলতার চোখের চাহনিটা হঠাৎ যেন কঠোর হয়ে ছোট্ট একটা ভ্রুকুটির মত কাঁপতে থাকে। - উনি ঠাট্টা করেছেন।

বাসনা কিন্তু শান্তভাবে হাসতে থাকে। কি-যেন ভাবে। তার পরেই সুলতার হাত ধরে টান দেয় - না, আর এখানে নয়। চলুন বাইরের ঘরে যাই।

বাইরের ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে ওঠে বাসনা—বাস্, এখানে আমার আর কোন কর্তব্য নেই। এখন আপনারা তর্ক করে নিষ্পত্তি করুন, কার ধারণা ভুল, কে মিথ্যে কথা বলেছে, আর কে-ই বা ঠাট্টা করেছে।

ঘর ছেড়ে চলে যায় বাসনা। ঘরের ভিতরে একটা চেয়ারের পিঠ ছুঁয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে যে, বাসনা যেন একটা চক্রান্তের আবেগে তারই চোখের সামনে সুলতাকে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে গেল।

যেমন সুলতা, তেমনই জয়ন্ত; দু'জনের কেউই নিশ্চয় এমন একটা অদ্ভুত মুখোমুখি দেখার ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সুলতার মুখটা

যেন লজ্জাক্ত, বিব্রত ও বিরক্ত। জয়ন্ত একটু বিচলিত, বোধহয় হঠাৎ এই অদ্ভুত সান্নিধ্যের বিস্ময় সহ্য করতে না পেরে ঘরের বাইরে চলে যেতে চায়।

যেন জোর করে হাসতে চেষ্টা করে জয়ন্ত।—না না, তর্ক করবার কিছু নেই। বাসনাকে আমি শুধু এই কথাই বলেছিলাম যে, আপনাকে আমি চিনি।

সুলতা হাসে—কিন্তু বাসনা তো বললো, আপনি অনেক কথা বলেছেন। আমাদের বাড়ির কথা, বাবার কথা, আমাদের ভদ্রতার কথা, আপনাকে খাবার খাওয়াবার কথা।

জয়ন্ত -হ্যাঁ, তাও বলেছি। সত্যি আমি একটু আশ্চর্য হয়েছিলাম।

সুলতা—কিন্তু শেষ কথাটা বোধহয় বাসনাকে বলতে ভুলে গিয়েছেন।

জয়ন্ত —কি?

সুলতা —রাগারাগির কথাটা।

জয়ন্ত—সেটা কোন কথাই নয়। যাই হোক···আপনি তো পরীক্ষা দিয়েছিলেন।

সুলতা —কেমন করে জানলেন?

জয়ন্ত হাসে - আপনাকে যে পরীক্ষা দিতে দেখেছিলাম। আমি যে গার্ড ছিলাম। আপনি আমাকে চিনতে পারেননি, কিন্তু আমি ঠিক চিনেছিলাম।

সুলতা--কেমন করে চিনলেন?

জয়ন্ত—সেইরকমই ধারণা হলো, তার মানে আপনাদেরই বাড়িতে হঠাৎ একবার আপনাকে দেখতে পেয়েছিলাম।

সুলতা—চিনেও তো একটা কথা বললেন না।

জয়ন্ত—বলতাম ঠিকই, কিন্তু···

সুলতা -- কি?

জয়ন্ত - হয়তো আবার ভুল বুঝবেন, এই ভয়ে···।

সুলতা উত্তর দেয় না। জয়ন্ত বলে—যাই হোক, ভালভাবে পাশ করেছেন নিশ্চয় ?

সুলতা—না, পাশ করিনি।

উত্তর দিতে গিয়ে সুলতার মুখটা যেন একটা বিদ্রূপের যন্ত্রণা চাপতে গিয়ে মেদুর হয়ে যায়।

জয়ন্ত হাসে—তাতে কি আসে যায় ? লেখাপড়া তো পরীক্ষায় পাশ করবার জন্যে নয়।

সুলতা—তবে কিসের জন্যে ?

—আমার ধারণা, আর বাসনাও বিশ্বাস করে, লেখাপড়া করতে ভাল লাগা, লেখাপড়ার অভ্যাস রাখাটাই বড় কথা। ওটা মানুষের জীবনের দরকার।

সুলতার চোখের তারা দুটো যেন একটা চমক খেয়ে কেঁপে ওঠে—বাসনার বিশ্বাসটা বোধহয় আপনিই তৈরি করে দিয়েছেন ?

জয়ন্ত – কি বললেন ?

সুলতা—আপনি যা বলছেন বাসনা তাই বিশ্বাস করেছে।

জয়ন্ত হাসে—মোটেই না। বাসনার হঠাৎ এরকম একটা ধারণা হয়েছে বলেই আমি…।

—কি ?

—আমার একটা লাভ হয়েছে। বাসনাকে সাহিত্য পড়াবার কাজটা পেয়ে গেছি। বাসনার ধারণা, ওর কিছুই লেখাপড়া হয়নি, যদিও বি-এ পাস করেছে। তাই ভাল করে পড়বার জন্য, বিশেষ করে সাহিত্য পড়বার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে টিউটর খুঁজেছিল। আমাদের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বাসনার বাবাকে বলে টিউটরগিরির কাজটা আমাকেই পাইয়ে দিলেন।

—আপনাদের কলেজ ?

—হ্যাঁ, আমি এখানেই একটা কলেজে ছাত্র পড়াই।

বুঝতে পারেনি সুলতা, কখন্ আর কেন সুলতার মুখটা এত প্রশান্ত

আর এত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে। যেন প্রচণ্ড একটা অপঘাতের আশঙ্কা থেকে সুলতার হৃৎপিণ্ডটাই বেঁচে গিয়েছে। আর, কি আশ্চর্য, বাসনার কাছে ছুটে গিয়ে এখনই যেন একটা ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করছে, ছি ছি, কিছু মনে করবেন না, কি-ভয়ানক মিথ্যে সন্দেহ করে আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম। বুঝতে পারিনি যে জয়ন্তবাবু আপনার লেখাপড়ার জীবনে একজন টিউটর মাত্র। তার বেশি কিছু নয়।

অদ্ভুত এক স্বস্তির সুখে সুলতার চোখদুটো আরও শান্ত হয়ে জয়ন্তর মুখের দিকে বড় স্পষ্ট করে তাকিয়ে থাকে। এই মানুষটাকেও যে বড় বেশি ভুল বুঝেছিল সুলতা। ভদ্রলোক শুধু একশো টাকার দরকারে বড়লোক অ্যাটর্নির মেয়ে বাসনাকে সাহিত্য পড়ায়; জীবনের কোন দরকারে নয়।

জয়ন্ত বলে—আচ্ছা, চলি এবার।···কিন্তু, বাসনা কোথায় গেল?

কে জানে বাসনা এখন বাড়ির ভিতরে কোন্ ঘরে কোথায় কার কাছে কোন্ গল্প নিয়ে ব্যস্ত আছে। বাসনা এখন একবার এখানে এলে সত্যিই বিদায় নিয়ে চলে যেতে পারবে জয়ন্ত। কিন্তু বাসনা এখনি আসবে বলে যে মনেও হচ্ছে না।

অগত্যা নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে কতগুলো অবান্তর কথা বলাও বোধহয় ভাল। জয়ন্ত বলে—আপনাদের বাড়িটাকে দেখতে আমার কিন্তু বেশ অদ্ভুত লেগেছে।

সুলতা হাসে—পুরনো ইতিহাসের ঘুমন্তপরীর মত?

জয়ন্ত অপ্রস্তুতভাবে হাসে—হ্যাঁ, বাসনাকে কথাটা বলেছিলাম বটে। কিন্তু···একটা কথা···একটা সত্য কথা জানেন কি? এ ধরনের জয়বিলাস এযুগে অচল।

সুলতা অপ্রসন্নভাবে আর মুখ ঘুরিয়ে বলে—এটা আর এ[illegible] নতুন কথা বললেন? সকলেই তো একথা বলে।

জয়ন্ত—কে বলে?

সুলতা—'আগামী' পত্রিকা বলে।

জয়ন্ত 'আগামী' পত্রিকা ? দিব্যেন্দু মিত্র যার মালিক ?

—হ্যাঁ, দিব্যেন্দু মিত্রকে আপনি চেনেন ?

—নাম শুনেছি। যাই হোক, আমি কিন্তু 'আগামী' পত্রিকার মত রাগ করে কথা বলছি না। সময় বদলে যায়, জীবনের ধারণা নতুন হয়ে যায়, তাই সেকেলে অনেক মহত্ত্বও অচল হয়ে যায়। তাজমহলও এযুগে অচল।

—তাজমহল দেখতে আপনার ভাল লাগে না ?

—খুব ভাল লাগে। কিন্তু এটাও জানি, কেউ আর নতুন করে তাজমহল গড়বে না।

সুলতার মুখের দিকে আর তাকিয়ে নয়, যেন কল্পনারই একটা ছবির দিকে তাকিয়ে কথা বলছে জয়ন্ত ; সঙ্গে সঙ্গে, কথা বলবার ভঙ্গী আর ভাষাটাও যেন কল্পনাময় হয়ে যায়।—সেই কথাই তো বাসনাকে বলেছিলাম। আপনাদের বাড়িতে সেদিন সেই নীলামের কাণ্ড দেখতে বড় খারাপ লেগেছিল। বড় অস্বস্তি হয়েছিল। বেশ একটু কষ্টও হয়েছিল। মনে করুন, তাজমহলটা যদি আপনাদের জয়বিলাসের মত অযত্নে ময়লা হয়ে যায়, আর ভিতরের দুই কবরের যত দামী পাথরের কারুকাজ নিলামে বিকিয়ে যায়, তবে ব্যাপারটা খুবই দুঃখের হবে না কি ? আমারও সেরকম মনে হয়েছিল। যদিও জানি তাজমহল গড়তে গিয়ে প্রেমিক বাদশাহ অনেক মানুষের অনেক শান্তি নষ্ট করেছিলেন। অনেক মানুষের দুঃখের রক্তে তাজমহলের ভিতের মাটি ভিজেছিল। তবু…।

কলেজের লেকচারার জয়ন্তর প্রাণে যেন একটা লেকচারের আবেশ লেগেছে।—তবু, সেদিন আপনার বাবার চোখের দিকে তাকাতে গিয়ে এক-এক সময় আমার চোখও যেন ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। মনে হলো, জিনিসগুলি বিকিয়ে দিতে খুবই কষ্ট পাচ্ছেন আপনার বাবা। আমার হঠাৎ মনে হয়েছিল, মানুষের ইতিহাসই যেন অসহায় হয়ে আর আঘাত পেয়ে ছটফট করছে।

একটা ঢোক গিলে নিয়ে তেমনই আনমনার মত, আর, যেন একটানা আবেগে কথা বলতে থাকে জয়ন্ত—আপনাদের দেখেও বড় অদ্ভুত লেগেছিল। আপনার বাবার ঐ ধবধবে ফর্সা চেহারা, চওড়া বুক; আর দু'হাতের মজবুত পাঞ্জার দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল, এই চেহারার সঙ্গে আর এই হাতে একটা ঝকঝকে তলোয়ারই চমৎকার মানায়। আপনার মাকে দেখে মনে হয়েছিল, যেন কোন মন্দিরের পূজারিণী। আর আপনাকে দেখে মনে হয়েছিল…

মাথা হেঁট করে, আর দুঃসহ একটা অস্বস্তি চাপতে গিয়ে ছটফট করে ওঠে সুলতা।

জয়ন্ত বলে—মনে হয়েছিল, যেন রূপকথার রাজকন্যার মত আপনিও…

দরজার কাছে পর্দাটা খস্‌খস্‌ শব্দ করে নড়ে ওঠে। বাসনা চেঁচিয়ে ওঠে—আমি এবার বাড়ি যাব মাস্টারমশাই।

যেন ধড়ফড় করে নড়ে ওঠে জয়ন্তের এতক্ষণের আনমনা মুখরতার অস্তিত্বটাই। জয়ন্ত বলে—হ্যাঁ, আমিও চলি।

চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে দিয়ে আর সুলতার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে জয়ন্ত—অনেক কথা বলে ফেললাম; তবু, ভুল ধরবেন না যেন।

আট

সেজমামী বলেন—তোমার এখন রায়মানিকপুরে ফিরে গিয়ে কোন লাভ নেই, সুলতা।

মাথা নেড়ে সেজমামার কথার সত্যতাকে যেন মনে-প্রাণে বরণ করে

নেয় সুলতা। আর, মনে মনে স্বীকারও করে, ঠিকই, কোন লাভ নেই। এখন কলকাতাতেই থাকতে ইচ্ছে করছে।

সেজমামী বলেন—তোমাকেও কি বাসনার মত খেয়ালে ধরেছে? দিন রাত বই পড়া আর শুয়ে পড়ে থাকা; এর মানে কি? মাথায় তেল দাওনি ক'দিন? মাথাটা ভাল করে আঁচড়াতেও কি হাত ব্যথা করে?

সেজমামী বেশ একটু অভিযোগের স্বরে কথা বলেন। সুলতা শুধু বিব্রতভাব হাসে—ভুলে গিয়েছিলাম।

সেজমামী বলেন—একে একে সব ভুলে যাচ্ছ, এটা ভাল নয়। পিয়ানো শেখবার যে কথা হলো, সেটা তো একেবারে ভুলেই গিয়েছ। এবার দেখছি, সাজতেও ভুলে যাচ্ছ।

কে জানে কেন, বোধহয় সেজমামীর অভিযোগ শান্ত করবার জন্যেই সেদিন বিকালে বেশ ভাল করে সাজে সুলতা। সেজমামী বলে দেননি, কিন্তু যেমনটি সাজলে সেজমামী খুশী হবেন, ঠিক তেমনটিই সাজতে পারে সুলতা। রঙীন নাইলনের শাড়ি, আর লখনউ জালির ব্লাউজ; দু'হাতে চুড়ি নয়, এক হাতে শুধু ছোট্ট একটি ওয়াচ, ফাঁপানো চুলের উপর ক্রীম ছিটিয়ে দিয়ে সামান্য একটু ব্রাশ করা। পায়ে সবুজ ভেলভেটের চটি।

সেজমামী খুশির স্বরে ডাকলেন—চল সুলতা।

—কোথায়?

—দিব্যেন্দু বম্বে থেকে ফিরেছে। চল, দিব্যেন্দুর মা-র সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।

চমকে ওঠে সুলতা। কিন্তু এভাবে চমকে ওঠার কোন কারণও খুঁজে পায় না। একটা কারণ এই হতে পারে, বোধহয় সুলতা এই আশা করেছিল যে, সেজমামী বোধহয় সুলতাকে সঙ্গে নিয়ে আজও আবার বাসনাদের বাড়িতে বেড়াতে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবেন।

দিব্যেন্দু মিত্রের বাড়ি, কোনদিন চোখে না দেখেও জানে সুলতা,

আমহার্স্ট স্ট্রীটের সেই বাড়ি হলো আধুনিক শখের একটি চমৎকার স্টাইলের বাড়ি। সে-বাড়ির নক্সা নাকি এক সুইস এঞ্জিনিয়ার তৈরি করে দিয়েছিল, বাড়ির সব ফার্নিচারের ডিজাইনও বিলেত থেকে আনানো হয়েছিল।

দিব্যেন্দু মিত্রের বাবা আজ আর বেঁচে নেই, কিন্তু যুদ্ধের সময় যে-টাকা তিনি রোজগার করেছিলেন, তাতে এই রকম আরও তিনটে বাড়ি তৈরি করতে পারতেন। যুদ্ধের আগেও, শুধু জজিয়তী চাকরির জীবনেও আশু মিত্র সম্পত্তিময় যে কীর্তির কাণ্ড করেছিলেন, সেটাও অনেকের কাছে বিস্ময়ের কীর্তি-কাণ্ড বলে মনে হয়েছিল। এই কলকাতা শহরেই চারটে বড়-বড় বাড়ি; ডুয়ার্সের একটা চা-বাগান, ধানবাদের একটা কোলিয়ারির আট-আনা মালিকানা, আশু মিত্রের স্ত্রী সরলা মিত্রের নামে কেনা হয়েছিল। অবসর নেবার সময় এসে পড়েনি, তখনই অর্থাৎ যুদ্ধের একটা বছর পার হবার আগেই, শারীরিক অসুস্থতার কারণে অবসর গ্রহণ করেছিলেন আশু মিত্র। আর, এই অবসরপ্রাপ্ত জীবনেই অদ্ভুতরকমের কর্মিষ্ঠ হয়ে, দিনরাত বড়বাজারে আনাগোনা করে, আর মাঝে মাঝে মিলিটারি সাপ্লাইয়ের নানা ধরণের নানা কর্তাকে পার্টি দিয়ে অনেক কনট্রাক্ট জোগাড় করতে পেরেছিলেন। মাত্র তিনটে কণ্ট্রাক্টের অনুগ্রহে ত্রিশ লাখ টাকা রোজগার করেছিলেন আশুতোষ মিত্র। আর, আমহার্স্ট স্ট্রীটের এই বাড়ি তৈরী করবার সময়েই ভেবে রেখেছিলেন, একমাত্র ছেলে দিব্যেন্দু যদি বিলেতে থেকে ব্যবসা করতে চায়, তবে লণ্ডনেও একটা বাড়ি কিনবেন।

আশু মিত্রের সেই কামনার স্বপ্নও কিছুটা সত্য হয়েছে। দিব্যেন্দু যদিও লণ্ডনে বাড়ি কেনেনি, কিন্তু এমন এক কাজের জীবন পেয়েছে, যে-জন্যে বছরে অন্তত ছ'টা মাস লণ্ডনে থাকবার দরকার হয়। যে কোম্পানির ম্যানেজার হয়েছে দিব্যেন্দু, সেই কোম্পানির ছ-আনা স্বত্বও আছে দিব্যেন্দুর।

কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রীটে হলেও দিব্যেন্দুদের বাড়িটা যেন

বিলেতী জীবনের অভিরুচি দিয়ে সাজানো। রান্না করে মগ কুক, ড্রাইভার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, আর দু'জন মেড যারা ঘরের কাজ দেখে, তারা হলো দুটি খাসিয়া মেয়ে, যারা হেসে-হেসে নাকে-মুখে ইংরেজী কথা বলতে পারে।

বাড়িতে খুব বেশি ভিড় নেই। কাকার মেয়েরা যে যখন আসে, আর যে ক'টা দিন থাকে, তখন আর সেই ক'টা দিন সারা বাড়ি যেন হাসির শব্দে আর পাউডার ও পমেডের গন্ধে উতলা হয়ে থাকে।

সেজমামীর কাছ থেকে এই সবই শুনেছে সুলতা। সেজমামী বলেছেন—বড়লোক তো কত রকমেরই থাকে। কিন্তু দিব্যেন্দুরা সে-রকম হেঁজিপেজি বড়লোক নয়। ওরা একেলে স্টাইলের বড়লোক, যেমন অগাধ টাকা তেমনই সুন্দর শখ।

চোখে দেখেনি, শুধু সেজমামীর বলা গল্পে শুনেছে সুলতা; দিব্যেন্দুর মা সরলাদি'ও বেশ সুন্দর শখের মানুষ। বয়স হয়েছে, বিধবা হয়েছেন, তবু রুক্ষ-সুক্ষ মানুষ নন। হাতে চুড়ি অবশ্য নেই, গলায় সোনার হার আছে। লাল-রঙা শাড়ি অবশ্য পরেন না, কিন্তু ফিকে চাঁপা রঙের সিল্কের শাড়ি পরেন। ডাক্তার বলেছেন, তাই বাধ্য হয়ে আর স্বাস্থ্যের জন্যই আমিষ খান।

সেজমামী বলতে গিয়ে হেসে ফেলেন—মেয়েগুলোও কি ভয়ানক খেতে পারে। চার মেয়ের জন্য চারটে মুর্গী রান্না করা হলেও কম পড়ে যায়; মগ কুক ধমক খায়।

শুনতে বেশ আশ্চর্য বোধ করেছিল সুলতা; কিন্তু শুনে অখুশি হয়নি। সুলতাও হেসে ফেলেছিল। দিব্যেন্দু মিত্রের সেই বাড়ির সুখ আর ঐশ্বর্যের স্টাইলের সঙ্গে নিজের মুখের এই হাসিকেও একদিন মিলিয়ে দিতে হবে, ভাবতে ভাল লেগেছিল সুলতার। আর, সেই সঙ্গে রায়মানিকপুরের এক শ্রীহীন সেকেলে রাজবাড়ির রিক্ত-নিঃস্ব জীবনের চেহারাটাও মনে পড়ে গিয়েছিল। ভাবতে গেলে বাবা আর মা-র জন্য দুঃখ হয়, মায়াময় একটা বেদনার বাষ্প যেন চোখ দুটোকে

ভিজিয়ে দেয়। কিন্তু সে-জন্যে জয়বিলাসের অভাব আর দারিদ্র্যের উপর মমতা করবার কোন মানে হয় না। জয়বিলাসের জীবন একটা অভিশাপের কারাগারে আবদ্ধ জীবন। ভুলতে পারে নি সুলতা, একদিন শুধু জয়মঙ্গলার প্রসাদে চারটে বাতাসা খেয়ে সারাদিনের ক্ষিদে দমিয়ে রাখতে হয়েছিল। সত্যিই যে, সেদিন রাজবাড়ি জয়বিলাসের ভাঁড়ারে একসেরও চাল ছিল না। সন্ধ্যা হবার পর যুগল সরকার এক মুদির কাছ থেকে ধার করা চাল-ডাল এনে দিয়ে গেল। মনে পড়ে সুলতার, সেই সন্ধ্যায় সংসারচন্দ্র রায়ের বংশধর সুরজিৎ রায় যেন একটা বদ্ধ পাগলের মত মূর্তি ধরে বাগানের ভিতরে আবছা-অন্ধকারের মধ্যে সেই জীর্ণ জন্দঘরের ভাঙা দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। কে জানে, বোধহয় এক রাজাবাবুর চাবুকের মারে আহত দুটো অধম দরিদ্রের কাতরানির আর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনছিলেন। বোধ হয় বুঝতে চেষ্টা করছিলেন সুরজিৎ রায়, আজ কি ভয়ানক জব্দ হয়ে গিয়েছে এক রাজাবাবুর অদৃষ্টের অহংকার!

ছিঃ, জয়বিলাসের এই ভয়ংকর দারিদ্র্যকে ঘৃণা করতেই ভাল লাগে। জয়বিলাস শুধু তার পুরনো অস্থিমাংসকে দফায় দফায় নীলামে বিকিয়ে দিয়ে কোনমতে বেঁচে আছে। আর সন্দেহও নেই যে, জয়বিলাসের মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখবারও কোন ক্ষমতা এই জয়বিলাসের নেই।

দিব্যেন্দু মিত্র তাই তো সুলতার জীবনে সত্যিই যে একটা পরম মুক্তির প্রতিশ্রুতি। সেজমামীও সে-কথা স্বীকার করেন।—সত্যিই এটা আমাদের সুলতার ভাগ্যের আশীর্বাদ, নইলে দিব্যেন্দুর মত ছেলে সুলতাকে বিয়ে করবার জন্য এত ব্যাকুল হবে কেন?

একদিন সেজমামার সঙ্গে তর্ক করে সেজমামী আরও কতকগুলি কথা বলেছিলেন।—আমি অত-শত বুঝি না। দিব্যেন্দুর টাকা আছে, এর চেয়ে বেশি কিছু আমি জানতে চাই না। সুরজিৎদার অবস্থা দেখে আমার খুব শিক্ষা হয়ে গেছে। ধর্ম-কর্ম সব মিথ্যে, যদি টাকা না থাকে।

নিজের মেয়ে নীরুর বিয়ের সময়েও এ ধরণের কথা বলেছিলেন

সেজমামী—মেয়ে বড়লোকের বাড়ির দাসী হয়ে থাকুক, তাও ভাল, কিন্তু কোন গরীবের বউ যেন না হয়।

সত্যিই পাত্রের জাত-পাত দেখেননি, বয়সও দেখেননি সেজমামী, পাত্রের অজস্র সম্পত্তি আছে, শুধু এইটুকু জেনেই তার হাতে নীরুকে সঁপে দিয়েছেন। আর, এখন দেখতে পাচ্ছেন, বেশ সুখেই আছে নীরু।

সুলতাও সুখী হোক্, সেজমামীর জীবনের এটাও একটা সাধ। আর, কোন সন্দেহ নেই যে, এই জন্যেই তিনি চান যে, দিব্যেন্দুর সঙ্গে যেন সুলতার বিয়েটা হয়ে যায়, কোন বাধা না দেখা দেয়।

তাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন সেজমামী— চল সুলতা। এবং জানেন যে, দিব্যেন্দুদের বাড়িতে যাবার জন্য এই অনুরোধের আহ্বান শুনে সুলতার প্রাণ কত ব্যস্ত হয়ে উঠবে।

কিন্তু, যেন একটা হঠাৎ বিস্ময়ের আঘাতে আহত হয়ে, আর বেশ একটু রুক্ষ স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে সুলতা—কেন ?

সেজমামীও আশ্চর্য হন।—কেন আবার কি ?

সুলতা—আমি কেন যাব ?

সেজমামী—তুমি যাবে না তো কে যাবে ?

সুলতা—যার আসবার ইচ্ছে, সে আসবে, আমি কেন যাব ?

সেজমামীর চোখ দুটো এবার আরও গভীর বিস্ময়ে যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। রায়মানিকপুরের রাজবাড়ির মেয়ের চোখে সত্যই যে তীব্র একটা অহঙ্কারের দ্যুতি জ্বলজ্বল করছে। দিব্যেন্দু মিত্রের বাড়িতে বেড়াতে যাবার এমন সুযোগটাকে যেন একটা অপমানের দাবি বলে সন্দেহ করছে। সত্যিই যে, যেন ভয়ানক অহঙ্কারের রাজকন্যাটি! যেন বলতে চায় এই মেয়ে, ইচ্ছে হয় তো একেলে বড়লোক দিব্যেন্দু মিত্র ছুটে এসে ভিখিরীর মত রায়মানিকপুরের এই মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকুক। তারপর দেখা যাবে, করুণা করা যায় কিনা।

—সত্যিই যাবে না? এবার যেন একটু ভীত হয়ে বিড়বিড় করেন সেজমামী।

—না। উত্তর দেয় সুলতা।

—কেন?

—ইচ্ছে করে না।

—কেন ইচ্ছে করে না?

—জানি না।

—তাহলে আমার কিন্তু আর কিছু করবার নেই।

হেসে ফেলে সুলতা—তোমাকে আমি দোষ দেব, এমন অদ্ভুত কথা তুমি ভাবছো কেন মামীমা?

সেজমামী হঠাৎ নীরব হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে, কে জানে কেন আঁচল তুলে দু'বার চোখ মুছলেন। তারপর জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে নিয়ে বললেন—জানি না, তোমাকেও বোধহয় বাসনার মত বাতিকে পেয়েছে।

চমকে ওঠে সুলতা—বাসনার বাতিক?

সেজমামী—হ্যাঁ, বাসনাও বলে, শুধু কতগুলো টাকা থাকলেই হয় না।

সুলতা—বাসনা কি খুব ভুল কথা বলেছে?

সেজমামী—ভুল, খুব ভুল কথা বলেনি ঠিকই...কিন্তু...তোমার বাড়ির কথা একবার ভেবে দেখ তো, সত্যিই ভাবতে ভয় হয় কিনা?

সুলতা—না, একটুও ভয় হয়না।

সেজমামী—কি বললে?

সুলতা—ভয় করবো কেন? ভয় করার কি আছে?

সেজমামী—এ যে একেবারে নতুন কথা বলছো। আগে তো কোনদিন এমন কথা বলনি?

মাথা হেঁট করে সুলতা। সেজমামীর এই অভিযোগ যে বর্ণে-বর্ণে সত্য। ভুলে যায়নি সুলতা, গত বছরেও একদিন সেজমামীর কাছে

দুই চোখ সজল করে যে-কথাটা বলেছিল সুলতা—রায়মানিকপুরে থাকতে আমার বড় ভয় করে।

সেজমামীও কেঁদে ফেলেছিলেন। ভয় না করে পারবেই বা কেন একুশ বছর বয়সের এমন সুন্দর একটা মেয়ে। জয়মঙ্গলার প্রসাদের বাতাসা খেয়ে সারাদিনের ক্ষুধা শান্ত করতে হলে কোন্ মেয়ের প্রাণ ভয় না পেয়ে থাকতে পারে।

কিন্তু···সুলতার প্রাণ যেন নিজেরই দুঃসাহসের কাণ্ড দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে। জয়বিলাসের এক নিঃস্ব রাজবাড়ির মেয়ে, যার গায়ে এখন সেজমামীর দেওয়া শাড়িটা দুলছে, আর হাতে সেজমামারই দেওয়া একটা উপহারের হাতঘড়ি ঝিকঝিক করছে, সে মেয়ের প্রাণটা আজ হঠাৎ কেমন করে এত নির্ভয় হয়ে গেল? কেউ যেন গোপনে মন্ত্র পড়ে দিয়ে সুলতার প্রাণে কঠোর এক অহঙ্কারের দীক্ষা দিয়ে চলে গিয়েছে।

কুণ্ঠিতভাবে, আর যেন একটা পুরনো অপরাধের লজ্জা চাপতে চেষ্টা করে সুলতা কথা বলে—নতুন কথা ঠিকই···কিন্তু··।

—কি?

—মিথ্যে কথা নয়।

সেজমামী আবার নীরব হলেন, কিন্তু খুবই তীব্রভাবে, আর, যেন একজোড়া জ্বলজ্বলে জিজ্ঞাসু চোখ অপলক করে নিয়ে সুলতার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তারপরেই বলেন—তবে কি বাসনাদের বাড়িতে বেড়াতে যাবে?

শিউরে ওঠে সুলতার চোখের তারা। সেজমামী যেন সুলতার বুকের ভেতরে লুকানো একটা নতুন দুঃসাহসের ছবি দেখে ফেলেছেন।

সেজমামীর অদ্ভুত প্রশ্নের আক্রমণে বিব্রত হলেও যেন নিজেরই উপর রাগ করে ছটফট করে ওঠে সুলতা।—না, কোথাও যাব না। বাসনাদের বাড়িতেও না।

সেজমামী হঠাৎ জানালার বাইরে দিয়ে গেটের দিকে তাকিয়ে বলেন—বাসনা এসেছে।

তারপরেই বলেন—হ্যাঁ, সেই ছেলেটিও এসেছে। বাসনার টিউটর জয়ন্ত।

॥ নয় ॥

সুলতার চোখে যেন দুঃসহ একটা অস্বস্তির ভ্রূকুটি শিউরে ওঠে। সেজমামী বড় বেশী গম্ভীর হয়ে যান। কিন্তু বাসনা ঘরের ভিতরে ঢুকেই চেঁচিয়ে ওঠে—জয়ন্তবাবুকে আমিই জোর করে ধরে নিয়ে এলাম।

সেজমামী জোর করে হাসেন তাহলে তোমরা এখন গল্প কর, আমি আসি।

বাসনা বলে—আমারও এখানে গল্প করার কিছু নেই। চলুন দয়ামাসীমা।

জয়ন্ত বিব্রতভাবে হাসতে চেষ্টা করে।—আমারও অবিশ্যি এখানে গল্প করবার কিছু নেই।

বাসনা—কেন নেই? একসেট শেক্সপীয়ার কিনতে গিয়ে যে কাণ্ডটা হলো সেটা কি অদ্ভুত একটা গল্পের কাণ্ড নয়।

জয়ন্ত - বাজে গল্প।

সেজমামী একটু আশ্চর্য হয়ে বলেন—কিসের বাজে গল্প?

বাসনা—জয়ন্তবাবু একদিন রায়মানিকপুরে গিয়েছিলেন। এঁদেরই বাড়ির এক সেট সেক্সপীয়র কিনতে। কিন্তু···।

জয়ন্ত—কিন্তু মিছিমিছি একটা তর্কাতর্কির ব্যাপার হয়ে গেল আমিই ওঁদের ভুল বুঝেছিলাম।

সুলতার মুখের দিকে তাকায় জয়ন্ত।

সুলতা হাসে—আমাদেরই ভুল হয়েছিল।

বাসনা বলে—এই তো বেশ, গল্প আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

সেজমামী উদাসভাবে জয়ন্তর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেন। উদাস স্বরে বলেন—আমি চলি।

বাসনা বলে - আমি একটু চা খাব দয়ামাসীমা।

সেজমামী বলেন—চল, খাবে!

বাসনা বলে—জয়ন্তবাবুও নিশ্চয় চা খাবেন।

বলতে বলতে সেজমামীর সঙ্গে ঘরের দরজা পার হয়ে চলে যায় বাসনা।

সুলতার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বলে—আপনি কিন্তু ভুল বুঝবেন না। এখানে এসে আপনাকে বিরক্ত করবার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না।

সুলতার কথার স্বরে তবু যেন একটা আপত্তিময় বিরক্তির ভাব ফুটে ওঠে। তবে কেন এলেন?

- বাসনা বলেছে, আপনি বিরক্ত হবেন না, তাই…।

—বাসনা বলেছে, আর আপনি তাই বিশ্বাস করে ফেললেন?

—হ্যাঁ…কিন্তু…আপনি বাসনাকে যেন ভুল বুঝবেন না।

—কেন?

—আমার কাছ থেকে কতগুলো গল্প শুনে বাসনার এরকম ধারণা হয়েছে।

—কিসের গল্প?

—আপনি তো সবই শুনেছেন। বই কেনার ব্যাপার নিয়ে যে কাণ্ড হয়েছিল।

—সে তো হয়েই গেছে কিন্তু…।

হঠাৎ নীরব হয়ে যায় সুলতা। তার পরেই, শঙ্কিতের মত অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, আর যেন গলার স্বরের একটা অশান্ত রূঢ়তা জোর করে চেপে দিয়ে মৃদুস্বরে বলে—ইচ্ছে ছিল না, তবু এলেন কেন?

জয়ন্ত বলে—ইচ্ছে ছিল।

জয়ন্তর মুখের দিকে সোজা চোখ তুলে তাকায় সুলতা। —আপনি ভুল করে খুব অন্যায় কথা আমাকে শোনালেন।

—অন্যায়?

—হ্যাঁ। আপনি কি জানেন না, বাসনাও কি জানে না যে, আমি কলকাতায় কেন এসেছি?

—আমি জানি, বাসনাও জানে।

—কি?

—দিব্যেন্দু মিত্রের সঙ্গে আপনার বিয়ে হবে।

—তা হলে বলুন জেনে শুনে অন্যায় করছেন।

—একটুও না।

—কি বললেন?

—আমি পাগল নই, মূর্খও নই। আপনার জীবনের কোন ইচ্ছাকে বাধা দেবার বাজে সাহস আমার নেই।

—সে ক্ষমতাও আপনার নেই।

—না। সে গরজও নেই।

—সে অধিকারও নেই।

—না, সে লোভও নেই।

—সে যোগ্যতাও নেই।

—না, সেরকম ছোট মনও নেই।

—আপনার সঙ্গে কথা বলবার কোন দরকার নেই।

—আমার এখানে আর বসে থাকবারও দরকার নেই।

আস্তে আস্তে, একটুও বিচলিত না হয়ে, অথচ কত শক্ত ও কঠোর

একটা মূর্তি ধরে চলে যাবার জন্যে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে জয়ন্ত।

সুলতা বলে—শুনুন।

—বলুন।

—আমার কথায় আপনি চলে যাচ্ছেন কেন? এটা আমার বাড়ী নয়।

—যাঁর বাড়ি তাঁকে একবার ডেকে দিন তাহলে। তাঁকে বলেই চলে যাই।

—আমি ডাকতে পারবো না। আপনার ছাত্রী চা নিয়ে আসুক। তাঁকেই বলবেন, সে আপনার হুকুম তামিল করবে।

সুলতার এই অদ্ভুত মুখরতা, এই বিচিত্র ঔদ্ধত্যের ভাষা, আর চোখের চাহনির এই রুক্ষ ও কঠোর ভঙ্গীটাকে একটুও বাধা মনে করে না জয়ন্ত। অনায়াসে তুচ্ছ করে চলে যেতে থাকে। কিন্তু চলতে গিয়েই যেন হঠাৎ আহতের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। রায়মানিক-পুরের গেঁয়ো রাজবাড়ির মেয়ের চোখে যেন দুর্বোধ্য এক অহঙ্কারের বেদনা জলে ভরে গিয়ে ছলছল করছে।

জয়ন্ত বলে—জানি না, বুঝতে পারছি না, আপনার চোখে জল কেন? দুঃখের, না ঘেন্নার, না রাগের, কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু বিশ্বাস করবেন, আপনাকে অপমান করে কথা বলবার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না।

সুলতা—ছিল।

জয়ন্ত—না।

—কেন?

—আপনাকে মনে মনে সম্মান করি।

—কেন?

—ভাল লাগে।

—তাতে আপনার লাভ?

—ভাল লাগে, শুধু এইটুকুই লাভ।

—আপনি খুব বেশি কাব্য পড়েছেন।

—পড়েছি।

—তাই শুধু কবিত্ব করে কথা বলছেন।

—হতে পারে। কিন্তু চেষ্টা করে কবিত্ব করছি না।

—হুঁ, আপনি মনে-প্রাণে কবি, তাই চেষ্টা করে কবিত্ব করেন না। ওটা আপনার অভ্যাস।

—হতে পারে।

—কিন্তু আমার কাছে কেন ?

—ভাগ্যের একটা ঠাট্টা। আপনার মত মানুষের কাছেই এরকম কথা বলতে হলো।

—ঠাট্টা বলছেন কেন ?

—ঠাট্টা বৈকি। আমার কাছ থেকে এরকমের কথা শুনতে যার একটুও ভাল লাগে না, তার কাছেই বলতে হচ্ছে।

—বুঝতে পেরেছেন তাহলে ?

—নিশ্চয়।

বেশ জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে দরজার দিকে তাকায় সুলতা ; মনে হচ্ছে, বাসনা বোধহয় চা নিয়ে আসছে।

না, বাসনা নয়, সেজমামী ওদিকের ঘরে চলে গেলেন। ওঘরের টেলিফোনের একটা ডাক ঝংকার দিয়ে বাজছে। অফিস থেকে সেজমামা বোধহয় কথা বলতে চাইছেন।

সুলতার মুখটা যেন অদ্ভুত রকমের শান্ত হয়ে সেই সঙ্গে বেশ একটু সুস্থির হয়ে যায়। এতক্ষণ ধরে যেন স্বপ্নে দেখা কতগুলি ভয় ভ্রান্তি আর আক্ষেপের সঙ্গে ঝগড়া করে কথা বলেছে সুলতা। প্রাণটা যেন মিথ্যে হয়রানি থেকে এতক্ষণে মুক্তি পেয়েছে। ভদ্রলোককে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে ; ভদ্রলোকও তাঁর দুরাশার ভুলটাকে মর্মে মর্মে বুঝে নিয়েছেন। জয়ন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে এইবার যেন বেশ সহজ ও

স্বচ্ছন্দ স্বরে কথা বলতে পারে সুলতা।—আপনিও নিশ্চয় কলকাতার মানুষ।

—এখন তো বটে।

—আগে?

—আগে বলতে গেলে একরকম পথের মানুষ ছিলাম।

—তার মানে?

—তার মানে, বাবা মারা যাবার পর পথে পথে ঘুরতে হয়েছে।

—তার মানে?

—আমি খুব গরীবের বাড়ির ছেলে। বাবা আমাদের গাঁয়ের জমিদার বাড়ির বাজার সরকার ছিলেন। ছেলেকে কলকাতার কলেজে পড়াবার খরচ জোগাবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তা ছাড়া, হঠাৎ মরেও গেলেন। কাজেই…।

—কি?

—কলকাতায় অনেক বাবুর বাড়িতে প্রায় চাকর খেটে আর ছেলে পড়িয়ে কলেজে পড়ার খরচ যোগাড় করতে হয়েছিল।

—আপনি কি করেন?

—এখন একটা কলেজে মাস্টারী করি…আর…সে খবর তো শুনেছেন, বাসনাকে পড়িয়ে একশো টাকা পাই।

—আপনার মা?

—আমার কাছেই আছেন।

—কোথায়?

—এখানেই, বাগবাজারে এক বাসায়।

সুলতা হাসে, যেন একটা সান্ত্বনার হাসি।

জয়ন্তও হাসে—বাগবাজারের একটা গলির মধ্যে বাসাটা। তবু মন্দ লাগে না। সব চেয়ে ভাল লাগে, অনেক রাতে যখন চারদিক নীরব হয়ে যায়, আর গঙ্গার ঢেউয়ের শব্দ বেশ স্পষ্ট করে শোনা যায়।

সে-সময় জানালা দিয়ে বেশ মিষ্টি একটা বাতাসও ঘরে ঢুকে ফুরফুর করে। আর…।

হঠাৎ কথা থামিয়ে হেসে ফেলে জয়ন্ত।

সুলতা—কি ?

জয়ন্ত—বেশ লাগে। সে-সময় বই পড়তে বেশ ভাল লাগে। মনে হয়, এভাবেই জীবনের রাতগুলি যদি পার হয়ে যায়, তবে মন্দ হয় না।

সুলতা—কিন্তু ওভাবে তো পার হবে না। একদিন বাধা আসবে।

—কিসের বাধা ?

—কেউ একজন নিশ্চয় আসবেন, যিনি বাধা দেবেন। হাত থেকে বই কেড়ে নেবেন।

গম্ভীর হয় জয়ন্ত—জানি না।

সুলতা—কিন্তু ইচ্ছে তো হয়।

জয়ন্ত—কিসের ইচ্ছা ?

সুলতা—কেউ একজন এসে বাধা দিক।

জয়ন্ত চুপ করে, আর অদ্ভুত রকমের একটা পিপাসার্ত দৃষ্টি তুলে সুলতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার পরেই, সেই পিপাসার্ত চোখ যেন ছটফট করে ওঠে।—হ্যাঁ ইচ্ছে হ । কিন্তু…।

সুলতা—কি ?

জয়ন্ত—কিন্তু তুমি এসব কথা জিজ্ঞেস করছো কেন ? তুমি তো আমার হাত থেকে বই কেড়ে নিয়ে বাধা দিতে আসবে না।

সুলতার চোখ থর থর করে কাঁপে।—খুব অন্যায় কথা বললেন।

বাসনা চা-এর কাপ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকেছে! জবাব দেবার আর সুযোগ নেই, তা না হলে জবাব একটা দিত নিশ্চয় জয়ন্ত। কিন্তু জয়ন্ত যেন নীরবে, শুধু সুলতার মুখের দিকে একবার করুণ ভাবে তাকিয়ে নিয়েই আবার মাথা হেঁট করে বুঝিয়ে দিতে চায়—সত্যিই খুব অন্যায় কথা বলা হয়েছে।

বাড়ির ফটকের সামনে একটা গাড়ির হর্নের শব্দ শোনা যায়। সেজমামী ব্যস্তভাবে বারান্দা থেকে ডাক দেন—তুমি একবার এদিকে এস সুলতা। মনে হচ্ছে, দিব্যেন্দু এসেছে।

বাসনা চেঁচিয়ে ওঠে—আইভি সরকারও এসেছে নাকি?

সেজমামী বলেন—জানি না, কিন্তু আইভিটা আবার কে?

বাসনা—জানেন না?

সেজমামী—না।

বাসনা—দিব্যেন্দুদার টেনিসের পার্টনার।

॥ দশ ॥
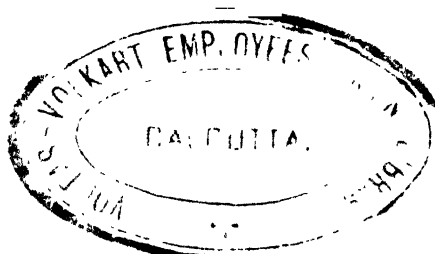
দিব্যেন্দুর গলায় রঙীন নেকটাই পাখার বাতাসে দুলছে। ঘরের ভিতরে শুধু দিব্যেন্দু, সেজমামী আর সুলতা।

সেজমামী বলেন—আমরা যে আজ তোমার ওখানেই যাবার জন্যে···।

দিব্যেন্দু সুলতার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে চমৎকার স্নিগ্ধ হাসি হাসে আর স্নিগ্ধ স্বরে কথা বলে। যাক্, পর্বত যখন মহম্মদের কাছে গেল না, তখন মহম্মদই পর্বতের কাছে আসবে।

সেজমামী হাসেন—আমি যাই, দেখি একবার···তুমি বোধহয় কফি ভালবাস দিব্যেন্দু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

চলে যান সেজমামী। দিব্যেন্দু বলে—তোমার পরীক্ষার ফল, তার মানে বিফলের খবর পেয়ে আমি অবিশ্যি একটুও দুঃখিত হইনি। কিন্তু—।

সুলতার কাছ থেকে কোন কথা শোনবার জন্য একটুও অপেক্ষা না করে নিজের মনের আবেগেই কথা বলতে থাকে দিব্যেন্দু—পিয়ানো টিয়ানোর ঝঙ্কারটও বোধহয় তোমার সহ্য হবে না। যাই হোক··· সেজন্য তোমাকে একটা মূল্যহীনা বলে মনে করবো, এমন ক্রুট আমি নই। তুমি আমার কাছে যা ছিলে, আজও তাই আছ। আমি তোমাকে ভালবাসি। বাস্, এর চেয়ে বেশি কিছু আমি জানি না। তুমি আমাকে ভালবাস, এর চেয়ে বেশি কিছু দাবিও আমার নেই।

সুলতা যেন শুধু একটা নীরব শ্রোতা প্রাণ; আর দিব্যেন্দু এক বক্তা। সুলতার সেই প্রাণের সব আশাকে আশ্বাস আর প্রতিশ্রুতিতে ভরে দিয়ে কথা বলতে থাকে দিব্যেন্দু।—আমি খবর পেয়েছি, তোমার বাবা দফায় দফায় বাড়ির যত সেকেলে আসবাব নীলামে বেচে দিচ্ছেন। ভালই করছেন। এছাড়া আর উপায়ই বা কি? বাঁচতে হলে···কিন্তু শেষ পর্যন্ত কতখানি বাঁচতে পারবেন জানি না···কতগুলো পুরোন ঢাল-তরোয়াল আর মেহগনির রাবিশ বেচে কি-ই বা হবে, আর তাতে ক'টা দিনই বা চলবে? একদিন পথে বসতে হবে, কেউ ঠেকাতে পারবে না। তোমাদের ঐ জয়বিলাসকেও বেচে দিতে হবে।

সুলতার তু'চোখ কাঁপিয়ে দিয়ে যেন একটা যন্ত্রণার জ্বালা চমকে ওঠে। দিব্যেন্দু হাসে—কিন্তু সেজন্য তোমার তো কোন দুশ্চিন্তা নেই সুলতা। তা ছাড়া···আমি থাকতে ওঁদেরও পথে বসতে হবে না।

সেজমামী এসে কফির পেয়ালা দিব্যেন্দুর হাতের কাছে রেখে দিয়ে চলে যান। দিব্যেন্দু বলে—আমি দয়ামাসীমাকে একথা বলবার জন্যেই এসেছিলাম।

সুলতা—কি কথা?

দিব্যেন্দু—তোমাকে যেন মিছিমিছি ব্যস্ত না করেন। পাস-টাশ করে তোমার দরকার নেই। তুমি যেমনটি আছ, নিশ্চিন্ত মনে তেমনটি থাকবে। আর, বিশ্বাস করবে, আমি আছি তোমার জন্যই।

—তোমার বিলেত যাবার কি হলো ?

—যাওয়া হবে। তবে খুব শিগ্‌গির নয়। কিন্তু তার আগেই একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

স্নিগ্ধভাবে হেসে কফির পেয়ালাতে চুমুক দেয় দিব্যেন্দু। সুলতা বলে—আইভি সরকার কে ?

চোখ বড় করে আর হেসে-হেসে সারা মুখের ভাব আরও বিচিত্র স্নিগ্ধতায় ভরে দিয়ে কথা বলে দিব্যেন্দু—আইভি আমার টেনিসের সঙ্গিনী।...যাই হোক্...তুমি যেন খুব কৌতূহলের সঙ্গে প্রশ্ন করছ ?

—হ্যাঁ।

—বাজে কৌতূহল। আর...আরও একটা কথা...

গলার স্বর মৃদু করে দিয়ে আর সুলতার মুখের দিকে নিবিড়ভাবে তাকিয়ে কথা বলে দিব্যেন্দু—আইভি সরকার দেখতে যতই ভাল হোক্, তোমার চেয়ে ভাল নয়।

সুলতা—পিয়ানো বাজায় ?

—হ্যাঁ। খুব ভাল বাজায়।

—বি-এ পাস বোধ হয় ?

—এম-এ।

—নাচতে জানে ?

—মন্দ জানে না।

—ভাল এটিকেট জানে ?

—চমৎকার জানে।...কিন্তু সে তো আমার সুলতার চেয়ে সুন্দর নয়।

—তুমি বাবাকে একটা চিঠি দাও।

—কিসের জন্য ?

—যাঁর মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করে নিজের ঘরে নিয়ে যাবে, তাঁকে চিঠি দিয়ে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া উচিত নয় কি ?

দিব্যেন্দু—চিঠি দেবার দরকার নেই।

—কেন ?

—আমি নিজেই যাব।

—কি বললে ?

—কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম, তোমার বাবা এইবার পথে বসবারই ব্যবস্থা করেছেন।

চমকে উঠে, চাপা আর্তনাদের মত স্বরে প্রশ্ন করে সুলতা
—কি বললে ?

—বিজ্ঞাপন দেখলাম, পুরনো বসতবাড়ি জয়বিলাসকেই নীলামে বিক্রি করা হবে। আর

—আর কি ?

—আরও অনেক রাবিশ বিক্রি হবে। অনেকগুলো বেলোয়ারী ঝাড়-লণ্ঠন, নবাব ওয়াজেদ আলি শা'র একটা বীণ, এক গাদা সংস্কৃত পুঁথি আর বাংলা কবচ, রূপোর পানদান দশটা...এমন-এমন অনেক বস্তু...আর এক সেট শেক্সপীয়র।

দিব্যেন্দুর স্নিগ্ধ হাসিটা এবার মুখর হয়ে যেন হো হো করে বাজতে আর কাঁপতে থাকে।

তারপরেই শান্তভাবে বলে—আমি নিজেই যাব। তোমার বাবার এই অবস্থায়, এই বিপদে আমার একবার যাওয়া উচিত।

চলে যায় দিব্যেন্দু। ফটকের কাছ থেকে যখন গাড়ির হর্ষমুখর শব্দটাও ছুটে চলে যায়, তখন সুলতার চোখের দৃষ্টিটা যেন মূর্ছাভঙ্গ মানুষের চোখের দৃষ্টির মত আস্তে আস্তে কাঁপতে থাকে। মনে হয়, দিব্যেন্দু মিত্রের যত ভালবাসার আর প্রশংসার মুখরতা যেন সুলতার সুন্দর চেহারার উপর একটা করুণার উল্লাসের মত আছড়ে পড়েছে আর খুশি হয়ে চলে গিয়েছে।

না, দিব্যেন্দুর ভালবাসায় কোন ভুল নেই। আইভি সরকার দিব্যেন্দু মিত্রের জীবনের কাছে কেউ নয়; বাসনা যেমন জয়ন্তর কেউ নয়; শুধু ছাত্রী। দিব্যেন্দুর জীবন তো বাগবাজারের কোন গলির

জীবন নয়; সে জীবনের ভালবাসার রীতিতে একটু অহঙ্কার থাকবেই বা না কেন? দিব্যেন্দুর করুণাভরা ভালবাসা সহ্য করতে গিয়ে অপমানিত বোধ করবারও কোন অর্থ হয় না। পৃথিবীর কে-ই না বা স্বীকার করবে, রায়মানিকপুরের গেঁয়ো রাজবাড়ির মেয়েকে বিয়ে করবে দিব্যেন্দু, এটা যে দিব্যেন্দুর মহত্ত্ব।

তবু এ কী শাস্তি। কিছুই যে ভাল লাগে না। মিথ্যে প্রশংসা করেছে কবিত্বপটু জয়ন্ত; সুলতার এই প্রাণটা রূপকথার মেয়ের প্রাণ নয়, একটা ভিখিরিণীর প্রাণ। দিব্যেন্দুর করুণার ভালবাসা ছাড়া যার আর কোন গতি নেই।

কিন্তু বাসনা কি চলে গিয়েছে? জয়ন্তও কি চলে গেল?

উদ্‌ভ্রান্তের মত ছটফট করে ঘরেব ভিতর থেকে ছুটে বের হয়ে বাইরের ঘরের দরজার পর্দা খিমচে ধরে সুলতা। দেখতে পায়, না, কেউ নেই।

ঘরের ভিতরে একা দাঁড়িয়ে আর দু'হাতে চোখ চেপে ফুঁপিয়ে ওঠে সুলতা। এ কী শাস্তি, দিব্যেন্দুর করুণার ভালবাসাকে এই মুহূর্তে একটা বড়লোকের ইচ্ছার রাবিশ বলে তুচ্ছ করতে আর ঘেন্না করতে কেন পারছে না সুলতা? এখনই কেন সেজমামীকে ডাক দিয়ে বলে দিতে পারে না সুলতা—না, এ বিয়ে হবে না।

না, এমন ভয়ানক সাহসের কোন মানে হয় না। রূপকথার রাজকন্যা বলে একটা মানুষ শুধু কবিত্বের কথা বলে গিয়েছে, রায়মানিকপুরের রিক্ত নিঃস্ব একটা গেঁয়ো রাজবাড়ির মেয়ের মনে নতুন অহংকার ভরে দিয়েছে। কিন্তু সে-জন্যে পাগল হয়ে যেতে হবে নাকি? কখ্‌খনো না।

দিব্যেন্দু মিত্রের বদলে জয়ন্ত মাস্টার? সুলতা রায়ের ভাগ্যটাও যে এ ঠাট্টা সহ্য করতে গিয়ে পাগল হয়ে যাবে। লোকেই বা বলবে কি? রায়মানিকপুরের সেকেলে রাজবাড়ি যতই দরিদ্র হয়ে যাক্ না কেন, সে মেয়েকে যে একেলে এক রাজবাড়িতেই মানায়। সে-মেয়ের

মনের ভেতরে যে রাজবাড়ি আছে। সে-মেয়ের রূপের মধ্যে যে রাজবাড়ির ছাপ আছে। সে-মেয়ের প্রাণের ভিতরে যে একশো বছরের রাজসুখের আশা লুকিয়ে আছে। বাগবাজারের কোন গলির আলো-ছায়ার আড়ালে লুকানো ছোট্ট একটা, আর শুধু খেয়ে পরে-বেঁচে-থাকা একটা সংসারকে আপন বলে মনে করা যে একেবারেই অসম্ভব ; ভাবতেও দুঃসহ।

মনে পড়ে সুলতার, যুগল সরকারের মা একদিন সুলতার মুখের দিকে তাকিয়ে আর মুগ্ধ হয়ে কি-কথা বলেছিলেন —তোমাদের অবস্থা পড়ে গেল, তাতে কি এসে যায়? তুমি তো রাজকন্যেই বট, মা। চাঁদের মাটি চাঁদেরই মাটি।

সম্মানের কথা শুনতে ভাল ; কিন্তু শুনতে ভাল লেগেছে বলেই কি জয়ন্ত মাস্টারের মত মানুষের হাত ধরে ফেলতে হবে?

ঘরের ভিতরে অনেকক্ষণ ধরে একলা হয়ে বসে থাকবার পর সুলতার ভাবনাগুলির গায়েও যেন ঝিম ধরে যায়। মনটাও যেন তন্দ্রাচ্ছন্নের মত অলস হয়ে যায়। আর, যেন শুনতেও পাওয়া যায়, এলোমেলো ভাবনাগুলিকে সান্ত্বনা দিয়ে বুকের ভিতরে কে যেন কথা বলছে।—সম্মানের কথা যে বলছে, তাকে দুটো সম্মানের কথা বলেই তো খুশি করে দেওয়া যায়। তাকে বিয়ে করবার কোন কথাই উঠতে পারে না।

বেশ তো, রায়মানিকপুর চলে যাবার আগে একদিন বাসনাকে নেমন্তন্ন করে ডেকে নিয়ে এসে বলে দিলেই চলবে—আপনার মাস্টার মশাই জয়ন্তবাবুকে দেখলে সত্যিই শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করে।

আরও একটা কথা বাসনাকে বলে দিতে পারা যায়—আপনার মাস্টার মশাই জয়ন্তবাবু বোধহয় জানেন না যে, সেদিন আমি নিজের হাতে সিঙাড়া ভেজে আর আনারস কেটে, কাঠের বারকোশের উপর সব খাবার ভাল করে সাজিয়ে দিয়ে বাইরের ঘরে পাঠিয়েছিলাম।

কিন্তু মুখখোলা বাসনা যদি জিজ্ঞেস করে বসে—কেন এ-কাণ্ড

করেছিলেন? মানেটা কি? একজন অচেনা মানুষের জন্য এত সমাদরের কাণ্ড কেন দরকার হলো?

বাসনার চতুর প্রশ্নটাকে একেবারে সত্য কথা বলে দিয়ে জব্দ করে দিলেই হবে।—বুঝতে পারেন না কেন? জয়ন্ত দেখতে বড় সুন্দর, অন্তত আমার চোখে খুবই সুন্দর লেগেছিল।

বাসনা যদি চোখের চাহনি শক্ত করে নিয়ে প্রশ্ন করে—তবে?

—তবে আবার কি? গল্পে পড়েননি, এক রাজকন্যে একদিন রাজবাড়ির অতিথিশালার এক সন্ন্যেসীর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। বাস, ঐ পর্যন্তই, সে জন্যে সন্ন্যেসীকে বিয়ে করবার কথা তার মনে হয়নি।

বাসনা হয়তো বলবে—গল্পের কথা আর কল্পনার কথা ছেড়ে দিন। জয়ন্তবাবু তো গল্প নয়, কল্পনাও নয়। একেবারে বাস্তব সত্য।

—তবে আপনিই বা এত অসত্য হয়ে আছেন কেন? জয়ন্তবাবুর মত মানুষকে চোখের কাছে পেয়েও আপনি তাকে বিয়ে করলেন না কেন?

সেজমামী ডাকেন সুলতা!

চমকে ওঠে আর চোখ মেলে সেজমামীর দিকে উদাসভাবে তাকায় সুলতা। সেজমামী খুশি হয়ে বলেন—তোমার মামা একটা নতুন খবর শোনালেন।

--কিসের খবর!

----এবার বাসনার বিয়ে শিগগিরই হয়ে যাবে।

-- কি?

—যার সঙ্গে বাসনার বিয়ে হবে বলে কেউ কেউ সন্দেহ করেছিল, সেই ছেলেটি দেশে ফিরেছে। জার্মানী থেকে বোম্বাইয়ে ফিরে এসেছে পরিতোষ।

—বাসনা কি…?

—হ্যাঁ, পরিতোষের সঙ্গে বাসনার অনেকদিনের চেনা-শোনা।

হেসে ফেলে সুলতা, আর মনের ভিতরে যেন একটা নীরব ঠাট্টার শব্দ শিউরে ওঠে—বাঃ, বাসনা মিত্রের ভালবাসা কত চালাক আর কত সাবধান। নিজেরবেলায় জয়ন্ত ওর কাছে শুধু তুচ্ছ এক মাস্টার মশাই। আর পরের বেলায়, রায়মানিকপুরের রাজবাড়ির মেয়ের বেলায় বাসনা মিত্র সেই তুচ্ছ মাস্টার মশাইকে সুলতার সামনে টেনে নিয়ে এসে ঘটকালি করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

সেজমামী বলেন আমার মনে হয়, তোমার এখন একবার রায়মানিকপুরে যাওয়া দরকার।

সুলতা বলে—হ্যাঁ।

॥ এগার ॥

জয়বিলাসের মেয়ের মুখের দিকে বেশ আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকেন সুরজিৎ রায়। বুঝতে পারেন না, এ কি-রকমের একটা বিষণ্ণ আর হতাশ মুখ নিয়ে কলকাতা থেকে ফিরে এল সুলতা।

প্রভাময়ীর চোখে যেন একটা শঙ্কার ছায়া ছমছম করে। হঠাৎ কলকাতা থেকে কেন চলে এল সুলতা? এলই যদি, তবে এরকম একটা শুকনো আর ভীরু মুখ নিয়ে ফিরে এল কেন?

কলকাতায় থেকে সেজ বউও কোন চিঠি দিল না কেন? দিব্যেন্দু কি বিলেত চলে গেল?

প্রভাময়ীর চোখে ভয়; কিন্তু সুরজিৎ রায়ের চোখে শুধু একটা বিস্ময়। সে বিস্ময়ের মধ্যে যেন একটা স্বস্তির ভাবও আছে। দিব্যেন্দু মিত্রের মত ছেলেকে আশা করাই যে জয়বিলাসের মেয়ের

জীবনে মস্ত বড় একটা ভুল হয়েছে, সুরজিৎ রায়ের এই সন্দেহ এতদিনে সত্য হয়েছে। তাই বোধহয় তাঁর বিস্ময়ের মধ্যে ঐ স্বস্তি ফুটে উঠেছে।

কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, সুলতার গম্ভীর স্বরের কথাগুলি সেই মুহূর্তে বুঝিয়ে দেয় যে, ভুল সন্দেহ করেছেন সুরজিৎ রায়।

প্রভাময়ী বলেন—হঠাৎ চলে এলি কেন?

সুলতা বলে—মামী বললেন।

প্রভাময়ী—কেন?

সুলতা—দিব্যেন্দুর ইচ্ছে, আমি এখন যেন রায়মানিকপুরে থাকি।

প্রভাময়ী—কেন?

সুলতা—দিব্যেন্দুর ইচ্ছে।

মেয়ের মুখের ভাষার এই নিদারুণ স্পষ্টতা, আর চোখের দৃষ্টিটারও এই অদ্ভুত অসঙ্কোচ, দেখতে অদ্ভুত লাগলেও মনে মনে যেন একটা স্বস্তি অনুভব করেন প্রভাময়ী। কলকাতায় গিয়ে একদিনের মধ্যেই মেয়ের ইচ্ছার দাবিটা যেন আরও মুখর হতে শিখেছে। লজ্জা করে কথা বলবার নিয়মটাও যে অনেকদিন আগেই ভুলে গিয়েছে এই মেয়ে। সে সত্য ভুলে যাননি প্রভাময়ী। তাই নতুন করে আর আশ্চর্য হতে পারেন না। একালের মেয়ের এই মুখর অলজ্জাকে নিন্দে করবারও কোন মানে হয় না। নিন্দে করবার শক্তিও নেই। সেকেলে রাজবাড়ি জয়বিলাসের নিঃস্বতা অনেকদিন আগেই তো ভয় পেয়ে চুপ করে গিয়েছে। মেয়ের স্বপ্ন আর আশাকে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, একটু সাবধান করে দিতেও পারেনি। সাবধান করে দেবার অধিকারও ছিল না।

প্রভাময়ীর সব দুশ্চিন্তার সান্ত্বনা এই যে, জয়বিলাসের অভিমানিনী মেয়ের আশার জীবনে কোন বাধা দেখা দিল না। দিব্যেন্দু মিত্র সত্যিই যে সুলতার জীবনের দায় এরই মধ্যে নিজের জীবনে তুলে

নিয়েছে। ভগবান করুন, সুখে থাকুক দিব্যেন্দু, সুখী হোক্ জয়বিলাসের মেয়ে। কলকাতায় সেজ বউয়ের কাছে এইবার চিঠি দিয়ে জেনে নিতে হবে, বিয়েটা কবে হলে ভাল হয়? দিব্যেন্দু কি বলে?

সুরজিৎ রায় কিন্তু আরও গম্ভীর হয়ে পুরনো জয়বিলাসের মীনা করা টালির মেজের উপর পায়চারী করে বেড়ান। দিব্যেন্দুর ইচ্ছার কথা শুনে যদি এতই আশ্বস্ত হয়ে থাকে সুলতা, তবে সুলতার চোখে হাসি ফুটে ওঠে না কেন? সংসারের নিয়ম-কানুন সবই কি এমন পাল্টে গিয়েছে যে, জীবনের একটা পরম উৎসবের ঘটনার দিকেও ভয়ে-ভয়ে তাকাতে হবে? রাজপুতের মেয়ের বিয়ে, সে বিয়ে যে আলো হাসি গান আর তরবারির হাসির ঝিলিক দিয়ে তৈরী একটা বিপুল অনুভবের উৎসব। মনে পড়ে, ছোড়দির বিয়ের কথা পাকা হবার খবর নিয়ে যেদিন চিঠি এসেছিল, ষাট বছর আগের এই জয়বিলাসেরই বুকের সেই হর্ষ আর কলরব যেন শুনতে পান সুরজিৎ রায়, ছোড়দি সেদিন চন্দন আর দুধের সর গায়ে মেখে, গান গেয়ে, আর হেসে হেসে ঐ দীঘির জলে স্নান করে এসেছিলেন। কিন্তু, সেই জয়বিলাসেরই রাজপুতের মেয়ে আজকের এই সুলতা; বারান্দার রেলিংয়ের উপর হাত রেখে আর এক জোড়া শুকনো চোখ তুলে কাঁকালির কিনারার কাশবনের দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে আছে। বাঃ, চমৎকার বিদ্রূপ! সুরজিৎ রায়ের শিথিল ভুরু দুটো যেন একটা যন্ত্রণার ভার সহ্য করতে গিয়ে আরও শিথিল হয়ে যায়।

সুলতা ঘরের ভিতরে চলে যায়। প্রভাময়ী এগিয়ে এসে সুরজিৎ রায়ের কাছে দাঁড়িয়ে কি-যেন বলতে চেষ্টা করেন। সুরজিৎ রায় আনমনার মত প্রশ্ন করেন—কি বলছো?

প্রভাময়ী—নিশ্চিন্তি হওয়া গেল।

সুরজিৎ রায়—হ্যাঁ।

—তুমি যা সন্দেহ করেছিলে, সেটা ভুল।

—কি সন্দেহ করেছিলাম ?

—দিব্যেন্দু শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে রাজি হবে না ; তোমার মনে বোধহয় এরকম একটা সন্দেহ ছিল।

—ছিল।

—তুমি দিব্যেন্দুকে ভুল বুঝেছিলে।

—হতে পারে।

—তুমি সুলতাকেও ভুল বুঝেছিলে।

—হতে পারে।

—কিন্তু আজ তো তুমি বুঝতে পেরে সুখী হয়েছ ?

—সুখী হতে পারছি না প্রভা।

প্রভাময়ী যেন একটু ক্ষুব্ধভাবে কথা বলেন—অদ্ভুত।

সুরজিৎ রায়—কি ?

—তোমার জেদ।

সুরজিৎ রায়—হ্যাঁ প্রভা, আমার জেদ। সবই তো গেছে ; সব দিক দিয়ে হেরে গেলাম। কিন্তু সুলতা যেন আমাকে সব চেয়ে বেশি হারিয়ে দিচ্ছে।

—একথার মানে ?

—কলকাতার বড়লোকের ছেলেকে বিয়ে করবার জন্য এত কাঙাল না হয়ে সুলতা যদি সন্ন্যাসিনীও হয়ে যেত, তবে আমার ভাল লাগতো। আমার প্রাণের শেষ জেদটুকু খুশি হতো।

—সে আর হবার নয়। সে কাল আর নেই।

—সেটা তো খুব ভাল করে সবাই মিলে বুঝিয়ে দিচ্ছে। তুমি আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছ কেন ?

প্রভাময়ীর চোখ দুটো করুণ হয়ে যায়। সংসারচন্দ্র রায়ের বংশধর, রাজবাড়ি জয়বিলাসের প্রভু সুরজিৎ রায়ের বুকের কোথায় কোন্ বেদনার জ্বালা ধিক ধিক করে জ্বলছে, সেটা বোধ হয় কল্পনায় দেখতে পান প্রভাময়ী।

স্বরজিৎ রায়ের গলার স্বরে যেন হঠাৎ একটা ঝড়ের আক্রোশ গর্জন করে উঠতে চায়। —এ বিয়ে কী সাংঘাতিক অসম্মানের বিয়ে, বুঝতে পারছো প্রভা? রাজপুতের মেয়ে যে সত্যিই যেচে আর ভিক্ষে করে একটা বড়লোকের ছেলেকে বিয়ে করতে চাইছে।

প্রভাময়ী—তুমি কি তাহলে আশা কর যে, সেই সেকালের মত এক রাজপুতের ছেলে এসে জোর করে মেয়ের হাত ধরে ...।

চেঁচিয়ে ওঠেন স্বরজিৎ রায়। সে নিয়ম যে তোমার একালের এই নিয়মের চেয়ে মেয়ের জীবনে শতগুণ সম্মানের নিয়ম ছিল। মেয়েকে ভালবাসার ভিখিরিণী হতে হতো না।

হেসে ফেলেন প্রভাময়ী, আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে যায়। —দুঃখ করে লাভ নেই।

স্বরজিৎ রায়ও হাসতে চেষ্টা করেন। লাভ নেই ঠিকই। রাজপুত মরেছে। চিরকালের মত মরেছে।

কথাটা শুনতে পায় সুলতা; আর সেই মুহূর্তে চোখের তারা দুটো জ্বলে ওঠে। তবে আর এত জোরগলায় চেঁচামিচি করা কেন? রাজপুতের অহংকারের পৃথিবীটাই যে মরে গিয়েছে। যে জয়বিলাসের মেয়েকে একদিন জয়মঙ্গলার প্রসাদের বাতাসা খেয়ে সারাদিনের ক্ষিদে মেটাতে হয়েছিল, সে জয়বিলাসের বাপ আজ দিবেন্দু মিত্রের মত মানুষকে মেয়ের জামাই করে নিতে এত অখুশি বোধ করছেন কোন অহংকারে?

কিন্তু সুলতার নিজেরই প্রাণটা যেন দুঃসহ একটা অখুশির জ্বালায় ছটফট করে ওঠে। বুকের ভিতরে ভয়ানক ধূর্ত একটা প্রশ্ন কথা বলছে; তুমি খুশি হতে পারছো কি? যদি খুশি হয়েই থাক, তবে এত আনমনা কেন? মুখে হাসি নেই কেন? চোখে এত ভয় কেন?

সত্যিই যে একটা ভয় সুলতার নিঃশ্বাসের ছন্দ ভেঙে দিয়ে উৎপাত করছে। কলকাতা থেকে যেন এক পলাতক আসামীর মত ভীরু মন নিয়ে রায়মানিকপুরে চলে এসেছে সুলতা। আসবার আগে

বাসনার সঙ্গে একবার দেখাও করেনি। যেন জয়ন্তকে দুটো কথা বলবার ভয় থেকে বাঁচবার জন্য হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে রায়মানিকপুরে চলে এসেছে। জয়ন্তকে যে আর বলবার মত কোন কথাই নেই।

আরও ভয় ছিল। দেখা করতে গেলে জয়ন্ত যদি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসতো, হঠাৎ রায়মানিকপুরে চলে যাচ্ছে কেন সুলতা? তবে? তবে কি কৈফিয়ৎ দিত সুলতা?

কি আশ্চর্য, এরকম একটা ভয় দেখাই বা দিল কেন? জয়ন্তকে তো অনায়াসে বলে দিতে পারা যেত, দিব্যেন্দুর ইচ্ছা, তাই রায়মানিকপুরে চলে যাচ্ছি। স্পষ্ট করে একথা বলে দেবার পর, বাসনার মাষ্টার সেই জয়ন্ত কি আর কোন প্রশ্ন করতো? কখ্খনো না, আর কোন প্রশ্ন করবার অধিকার তো জয়ন্তকে দেয়নি সুলতা?

কিন্তু তবু ভয়।

রায়মানিকপুরের সেকেলে রাজবাড়ির নীরব আর উদাস ঘরের এক কোণে বসে সারাদিন পার করে দিয়েও সে-ভয়টাকে যেন পার করে দিতে পারা যাচ্ছে না। কাঁকালির কাশবনের ঝড়ের শব্দ শুনে মাঝরাতের প্রহর পার করে দিলেও যেন-ভয়টা নীরব হয়ে যায় না। জয়বিলাসের মেয়ের ঘুমের মধ্যেও একটা স্বপ্ন ভয় পেয়ে চমকে ওঠে। জয়ন্ত হেসে হেসে জিজ্ঞাসা করছে, পালিয়ে গেলে কেন?

সকালে ঘুম ভেঙ্গে যাবার পরেও ভয়টা আবার যেন সুলতাকে পেয়ে বসে। মনে হয়, আর একটু পরে, আজকেরই ডাকে কলকাতা থেকে হয় বাসনার, নয় জয়ন্তর চিঠি আসবে। আর, চিঠিতে সেই প্রশ্নটাই কৈফিয়ৎ দাবি করে সুলতাকে বিরক্ত করবে—তুমি পালিয়ে গেলে কেন? যাবার আগে একটা কথাও বলে গেলে না কেন?

কিন্তু পর পর সাতটা দিন পার হয়ে গেলেও কলকাতা থেকে কোন চিঠি আসে না। সুলতার মন যেন একটা স্বস্তির হাঁপ ছাড়তে পারে। না, সুলতার জীবনে জয়ন্ত নামে কোন উপদ্রব সত্যিই ব্যস্ত হয়ে ওঠেনি। সে উপদ্রবের অন্তরাত্মায় কোন দুঃসাহসও নেই।

দিব্যেন্দু মিত্রের সঙ্গে যে-মেয়ের বিয়ে হবে, তার জীবনের উপর কোন লোভের হাত এগিয়ে দেবার মত মূর্খতা করতে রাজি নয় জয়ন্ত।

কি আশ্চর্য, জয়ন্তও নীরব হয়ে গেল। জয়বিলাসের মেয়ের চোখের উপর একটা ঠাট্টা যেন নীরবে হেসে হেসে অপমান ছড়াতে থাকে। রূপকথার মেয়ের মত যাকে মনে হয়েছে, তাকে একটা চিঠি দেবার মত কোন উৎসাহ নেই; এমনই ভীরু হয়ে গিয়েছে জয়ন্ত নামে সেই শান্ত হাসির মানুষটার প্রাণ? শুধু কয়েকটা কবিত্বের কথা বলে জয়বিলাসের মেয়েকে একটু খুশি করে মজা দেখবার একটা চেষ্টা মাত্র, তারই নাম জয়ন্ত। জয়ন্তের মত মানুষের সঙ্গে এই কদিনের পরিচয়ে, এত কথা, আর ঐ কথা কাটাকাটি জয়বিলাসের মেয়ের জীবনে একট দুর্ঘটনা মাত্র।

কিন্তু চিঠি আসে; সে চিঠি দিব্যেন্দুর।—আমি খুব শিগগির রায়মানিকপুরে যাচ্ছি।

—কার চিঠি? প্রশ্ন করেন প্রভাময়ী।

—দিব্যেন্দুর চিঠি। উত্তর দেয় সুলতা। আর প্রভাময়ীও দেখতে পান, কথা বলতে গিয়ে সুলতার চোখ দুটো যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

প্রভাময়ী বলেন—কিন্তু বাসনার কাছ থেকে এ কিরকমের একটা চিঠি পেলাম।

—কে? বাসনা?

—হ্যাঁ, দিব্যেন্দুর খুড়তুতো বোন হয়, বাসনার সঙ্গে তোর ও তো চেনাশোনা হয়েছে।

—হ্যাঁ। চিঠিতে তাই লিখেছে বোধহয়?

—হ্যাঁ, আরও একটা কথা লিখেছে।

চমকে ওঠে সুলতা।—কি কথা?

প্রভাময়ী—সেই ছেলেটিরই নাম জয়ন্ত।

সুলতা—কে?

প্রভাময়ী—ঐ যে, নীলামের দিনে এখানে বই কিনতে এসেছিল আর রাগ করে চলে গিয়েছিল।

সুলতা—হ্যাঁ।

প্রভাময়ী—কোনদিনও তো বলিসনি যে, কলকাতাতে জয়ন্তর সঙ্গে তোর দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে?

সুলতা—কতলোকের সঙ্গেই তো দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। সবারই কথা কি তোমাদের কাছে বলেছি? বলবার কোন দরকারও হয় কি?

প্রভাময়ী—কিন্তু বাসনা যে-কথা লিখেছে, তাতে মনে হয় যে…।

ভ্রূকুটি করে তাকায় সুলতা—কি মনে হয়? কি লিখেছে বাসনা?

প্রভাময়ী—বাসনা লিখেছে, জয়ন্ত খুব ভাল ছেলে।

সুলতা—হতে পারে।

প্রভাময়ী যেন হতাশভাবে সুলতার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন।—এ ছাড়া তোর আর কিছু বলবার নেই?

সুলতা—না।

প্রভাময়ী—তাহলে বাসনা ভুল বুঝেছে?

সুলতা—হ্যাঁ।

প্রভাময়ী—বুঝলাম।

চলে যান প্রভাময়ী। আর, সুলতা যেন নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অদৃষ্টের একটা ঠাট্টার শব্দ শুনতে থাকে। বাসনার চিঠিটাই একটা নির্মম ঠাট্টা। সুলতার অদৃষ্টের শান্তি নষ্ট করতে চেষ্টা করছে বাসনার এই চিঠি। কোন্ সাহসে জয়ন্তর কথা চিঠিতে লিখতে পারলো বাসনা? ভীরু মাষ্টার মশাই সত্যিই কি ছাত্রীকে দিয়ে দূতীয়ালী করাতে শুরু করেছেন? কোন্ সাহসে? কোন্ অধিকারে?

এতক্ষণ দেখতে পায়নি, এইবার দেখতে পায় সুলতা; আয়নাতে সুলতার মুখের ছবিটাও সুস্থির হয়ে রয়েছে। আর, কি আশ্চর্য, সে ছবির চোখ দুটো জলে ভিজে গিয়েছে।

ছি ছি; মানুষটাকে শেষবারের মত দুটো ভাল কথা, দুটো সান্ত্বনার কথা শুনিয়ে এলে কি ভুল হতো? অনায়াসে বলে দিতে পারা যেত, তুমি আমার কথা আর ভেব না জয়ন্ত। আমাকে রূপকথার মেয়ে বলে মনে করে খুবই ভুল করেছ। আমি একেবারে একালের এই সাংঘাতিক পৃথিবীর একটা চালাক মেয়ে। তোমাকে ভাল লাগলেও ভালবাসতে পারবো না। ভালবাসতে পারলেও তোমার ঘরে যেতে পারবো না। আমি রায়মানিকপুরের রাজবাড়ির মেয়ে: গরীব হওয়ার আপমান সহ্য করতে পারি না, এটা আমার অপরাধ নয়। গরীবের ঘরে যেতে ভয় করে, এটা আমার দোষ নয়, জীবনের ভুলও নয়।

ঠিকই চোখের দৃষ্টিতে করুণ ভাবনার বাষ্প দেখা দিয়ে সুলতার প্রাণটাকে করুণ করে দিলেও বুঝতে পারে সুলতা, জীবনের আশাটা যেন হিসেব করে সাবধান হতে চাইছে। সেই হিসেবের মধ্যে কোন মোহ নেই। বাগবাজারের গলির ভিতরে, কলেজের ছাত্র পড়ানো এক মাস্টারের জীবনের ঘরণী হয়ে কতদিন খুশি হয়ে বেঁচে থাকতে পারবে সুলতার ভালবাসার প্রাণ? জয়ন্তর মুখ থেকে কবিত্বের কথা শুনে কতদিন মুগ্ধ হয়ে থাকতে পারবে রায়মানিকপুরের রাজবাড়ির মেয়ের মন? তখন এই জয়ন্তকে শুধু সহ্য করতে হবে: কিংবা এমন দুর্ভাগ্যও হতে পারে, আর সহ্য করতেই পারা যাবে না। টাকার অভাবে যে মেয়ের একটা সামান্য সখের আশাকেও ভয় পেয়ে চুপ করে থাকতে হবে, সে-মেয়ের মন গরীব স্বামীকে বড় জোর ক্ষমা করতে পারবে; কিন্তু সুখী হতে পারবে না।

না, আর ভুল করতে চায়না সুলতা। ভুল করবার ইচ্ছাটাকেও যেন জোর করে থামিয়ে দিতে চায়। জয়বিলাসের বাপ আর মা, দু'জনেই আশ্চর্য হয়ে দেখতে পান, দিব্যেন্দুর চিঠি আসবার পরেই মেয়ের চোখের দৃষ্টি আর মুখের হাসি যেন বদলে গিয়েছে।

॥ বার ॥

দেবদারুর ছায়ার কাছে, কিংবা শেষ বিকেলের রঙীন রোদের মধ্যে যখন ঘুরে বেড়ায় সুলতা, তখন মনে হয়, যেন এক খুশির হরিণী ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী চমৎকার সাজ করেছে সুলতা। সে সাজের ষ্টাইল যেন সেকেলে জয়বিলাসের চেহারাকে একটা রঙীন ঠাট্টা দিয়ে তুচ্ছ করে খুশি হতে চাইছে। মনে হয়, সুলতার প্রাণটা যেন দিব্যেন্দু মিত্রের আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের সেই বিপুল ফ্যাশনের বাড়ির যত সাধ আর আকাঙ্ক্ষার আলো-ছায়ার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুলতার খোঁপাটা যেন আধা-হলিউড আর আধা-অজন্তা। তিন ফালির ত্রিভুজের মত ছোট্ট আকারের একটা ব্লাউজ পিঠের প্রায় অর্ধেকটা খোলা। কোমরে গোঁজা মিহি শাড়ির আঁচল ঝালরের মত দুলছে। হাঁটবার ভঙ্গীও অদ্ভুত। যেন অদৃশ্য এক পিয়ানোর রাগিণীর সঙ্গে শরীর দুলিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে সুলতা। দেখে মনে হয়, সত্যিই যেন এক বিদেশিনী তরুণী হঠাৎ রায়মানিকপুরের মত এক পাড়াগেঁয়ে জগতে এসে পড়েছে।

ফটকের দিকে তাকিয়ে থাকে সুলতা। কোন সন্দেহ নেই, দেখে প্রভাময়ীও বুঝতে পারেন, দিব্যেন্দু আজ আসতে পারে বলে মনে হয়েছে, তাই ওভাবে ফটকের দিকে তাকিয়ে আছে সুলতা।

সুরজিৎ রায় শুকনো স্বরে প্রশ্ন করেন—দিব্যেন্দু কি আজ আসবে?

প্রভাময়ী—সুলতার কাণ্ড দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।

সুলতারই এই ফুল্ল মূর্তিটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেন সুরজিৎ রায়। সেকেলে জয়বিলাসের রাজপুত-চোখের দৃষ্টিটার উপর যেন এক গাদা ঠাট্টার ধুলো ছিটকে এসে পড়েছে।

প্রভাময়ী বলেন—কি হলো ?

সুরজিৎ রায়—একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি।

—বল।

—আচ্ছা, ঐ মেয়েকে দেখে কেউ কি মনে করতে পারবে, ও-মেয়ে আমার মেয়ে, এই জয়বিলাসের মেয়ে ?

প্রভাময়ী বিরক্ত হন।—এসব কথা তোমার কেন যে মনে হয়, বুঝি না। তুমি কি আশা কর যে, সুলতা তোমার ঠাকুমা'র মত চুমকিদার জালির ওড়না জড়িয়ে আর আধসের সোনার কাঁকন পরে ঘুরে বেড়াবে ?

সুরজিৎ রায়—কি বললে ?

প্রভাময়ী—আধসের সোনার কাঁকন মেয়েকে পরাতে পারবে ?

চমকে ওঠেন সুরজিৎ রায়। প্রভাময়ীর কথাটা যেন জয়বিলাসের নিঃস্ব বুকটার ভিতরে গিয়ে বিঁধেছে।

প্রভাময়ী বলেন—ওসব কথা ছেড়ে দাও।

এইবার সুরজিৎ রায় যেন চেঁচিয়ে উঠতে চেষ্টা করেন।—আধসের সোনার কাঁকন না দিতে পারি, এক ভরির রুলি তো দিতে পারতাম।

প্রভাময়ী—তাতে কি হতো ?

সুরজিৎ—তাতে তোমার মেয়েকে সব চেয়ে ভাল মানাতো।

—তার মানে ?

—তার মানে, যেমন ঘরে ওকে আজ মানাবে, তেমন ঘরে যেতে পারতো।

—একথারই বা মানে কি ?

—সেই ছেলেটির মত একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে হতো। সেটাই সব চেয়ে ভাল হতো।

—কোন ছেলেটির মত ?

—সেই যে, নীলামের দিনে বই কিনতে এসেছিল যে ছেলেটি ; কলেজে ছাত্র পড়ায়।

হেসে ফেলেন প্রভাময়ী—সে তো আর হবার নয়।

কিন্তু দুটো দিন পার হতেই আবার আশ্চর্য হন জয়বিলাসের বাপ আর মা। মেয়ে আবার এ কি কাণ্ড করে বসে আছে?

দিব্যেন্দু আসেনি। কোন চিঠিও আসেনি। কিন্তু, শুধু এই জন্যেই কি এই দুদিনের মধ্যে সুলতার প্রাণের আশা একেবারে বদলে গেল? নইলে এরকম অদ্ভুত কাণ্ড করছে কেন সুলতা?

প্রভাময়ী দেখেছেন, অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কি-যেন ভাবছিল সুলতা। থমথমে মুখ আর ছলছলে চোখ। তারপরেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সুলতা।

প্রভাময়ীকে আজ আর রান্নাঘরে ঢুকতে দেয়নি সুলতা। রান্না-ঘরটাকে নিজেই ঝাঁটা চালিয়ে আর জল ঢেলে ধুয়েছে। সব বাসন-পত্র নিজের হাতে ধুয়েছে। রামশরণও দেখে চমকে উঠেছে; উনুনটা নিজের হাতেই ধরিয়েছেন দিদি। প্রভাময়ীকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করেনি, নিজেই ইচ্ছামত রান্না করেছে সুলতা।

দুপুরেও চুপ করে থাকেনি সুলতা। তিনটে ঘরকে নিজের হাতে পরিষ্কার করেছে আর সাজিয়েছে। সোডার জল দিয়ে যত পুরনো পাথরের রেকাবিগুলিকে ধুয়েছে।

বিকেল হবার পরও সুলতার এই কাণ্ড থামেনি। সাজ বলতে শুধু মোটা একটা বিনুনী বেঁধেছে আর কল্কা পেড়ে আধময়লা সাড়িটাকেই পরেছে। আবার ঘর গুছিয়েছে। প্রভাময়ী বার বার বাধা দিয়েছেন—এবার একটু চুপ করে বস তো সুলতা। ঢের হয়েছে।

সুলতা হাসে—ঢের আবার কি দেখলে?

প্রভাময়ী—না। এবার থাম।

সুলতা—বাবার জন্যে সরবতটা তৈরী করে দিই, তারপর…।

—না, তারপর আর কিছু নয়। প্রভাময়ী এবার রাগ করে ধমক দেন।

সরবত তৈরী করে নিয়ে, পাথরের গেলাসটা হাতে করে যখন সুরজিৎ রায়ের কাছে এসে দাঁড়ায় সুলতা, তখন সুলতার মুখের দিকে অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে থাকেন সুরজিৎ রায়। সে চোখ যেন অদ্ভুত এক তৃপ্তির ভারে করুণ হয়ে গিয়েও হাসছে।

কি আশ্চর্য, এ মেয়েকেও তো এই জয়বিলাসের মেয়ে বলে মনে হচ্ছে না। তবু দেখতে এত ভাল লাগছে কেন? এই আধময়লা শাড়ি আর মোটা বিনুনী, রাজবাড়িব মেয়ের এমন সাজ হতে পারে না। তবু মনে হয়, এই মেয়ে যেন দুঃখী রাজবাড়ি এই জয়বিলাসের ব্যথার মায়াটাকে আদর করে নিজের চোখে-মুখে বুলিয়ে দিয়েছে। এ মেয়ের চোখে কলকাতার কোন প্রাসাদের রঙীন ছায়া ঝলমল করে না। এ মেয়ে যেন একটা গরীবের ঘরের স্বপ্ন হয়ে নিজেকে একটি স্নিগ্ধ ও শান্ত শোভা দিয়ে তৈরী করে নিয়েছে। ভুল, খুবই ভুল সন্দেহ করেছিলেন সুরজিৎ রায়। তাঁর মেয়ে গরীবের বাড়িকে ঘৃণা করে না। এ মেয়ের সাহস আছে, গরীবের সংসারে হেসে-খেলে আর কাজ করে সুখী হবার মত শক্তি এ মেয়ের আছে।

সুরজিৎ রায় বলেন—শুনলাম, সেই ছেলেটির সঙ্গে কলকাতাতে তোর দেখা হয়েছিল?

চমকে ওঠে সুলতা।—হ্যাঁ।

সুরজিৎ রায়—নামটা কি-যেন? জয়ন্ত? তাই না?

সুলতা—হ্যাঁ।

সুরজিৎ রায়—কথাবার্তায় বেশ ভদ্র বোধহয়?

—হ্যাঁ।

—তোর কাছে বোধহয় কোন অভিযোগের কথা বলেনি?

—কিসের অভিযোগ?

—ঐ যে, বই কেনার ব্যাপার নিয়ে ছেলেটির সঙ্গে এখানে যে-ব্যাপারটা হয়ে গেল, সেটা তো আমাদের পক্ষে খুব একটা ভদ্রতা-সম্মত ব্যবহার হয়নি।

সুলতা বলে—না, সে-সব অভিযোগের কোন কথা ভদ্রলোক বলেননি। বরং…।

—কি?

—বরং, তোমাকে খুব প্রশংসা করলেন।

—তার মানে? চমকে ওঠেন সুরজিৎ রায়।

সুলতা হাসে।—প্রশংসা মানে…তোমাকে নাকি ইতিহাসের মানুষ বলে জয়ন্ত বাবুর মনে হয়েছে।

সুরজিৎ রায়ের সাদা মাথাটা যেন একটা বিহ্বলতার আবেগে দুলে উঠতে চায়। নিঃস্ব রাজবাড়ি এই জয়বিলাসের অভিমানের আত্মাটাকে এই প্রথম শ্রদ্ধা দিয়ে যেন অভিনন্দিত করেছে আধুনিক কালের একটা প্রাণ। এ যে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। মরা বাঘকে ধুলোর উপর লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখে কারও মনে মায়া হতে পারে, বিশ্বাস করা যে যায় না। মরা জয়বিলাসের হাড় মাংস নীলামে লুট করে নিয়ে যাওয়াই আধুনিক কলকাতার আনন্দ। সে জয়বিলাসের দীনহীন রাজা-বাবুকে শ্রদ্ধা করবে আর মায়া করবে এমন মানুষ কি সত্যই আছে?

সুরজিৎ রায়।—কিন্তু ছেলেটি তো আর একদিনও এল না।

সুলতা—বলছিলেন, এখানে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা আছে।

সুরজিৎ রায় হঠাৎ উৎফুল্ল স্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন—আসুক আসুক। খুব ভাল কথা।

সুলতার চোখে যেন ছোট্ট একটা ভ্রূকুটির ছায়া হঠাৎ চমকে ওঠে। —কিন্তু আসবে বলে মনে হয় না।

সুরজিৎ রায়—কেন?

ভ্রূকুটী করে একটা চক্ষুলজ্জাকে চাপতে পারলেও এইবার গলার স্বরের অদ্ভুত একটা রুক্ষতা চাপতে পারে না সুলতা। মুখের ভাবাও

যেন বেশ স্পষ্ট আর বেশ রূঢ় হয়ে অদ্ভুত এক অভিমানের মত বেজে ওঠে।—ওরা ঐ রকমেরই মানুষ?

আশ্চর্য হন সুরজিৎ রায়।—কারা?

সুলতা—বাসনার মাষ্টার জয়ন্ত বাবু। মানুষটা অভদ্র নয়, কিন্তু কেমন যেন ভীতু স্বভাবের মানুষ।

—ভীতু স্বভাবের? সুরজিৎ রায় আরও আশ্চর্য হন। —ছেলেটিকে দেখে আমার তো অন্যরকমের ধারণা হয়েছিল। মনে হয়েছিল, বেশ তেজ আছে, বেশ একরোখা, বেশ রাগী আর শক্ত স্বভাবের মানুষ।

উত্তর দেয় না সুলতা। মুখের ভাষাটা যতই বেহায়া হয়ে উঠুক, এর বেশি বেহায়া হয়ে কথা বলতে পারবে না। কোন মেয়ে তার জীবনের এরকম একটা অভিমানের কিংবা সন্দেহের কথাকে আর বেশি স্পষ্ট করে বাপের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেও না।

সত্যিই যে জয়ন্তকে কেমন-যেন ভীতু স্বভাবের মানুষ বলে মনে হয়েছে সুলতার। ভালবাসে যদি, তবে স্পষ্ট করে বলতে পারে না কেন? ছুটে আসতে পারে না কেন? কাছে এসে জোর করে দাবি জানাতে পারে না কেন?

ভাবতে একটুও ভাল লাগে না। গরীব মাষ্টারের মনটা গরীব হবে কেন? রাগ নেই, জোর করতে পারে না, ছুটে এসে পথ রোধ করতে জানে না, এমন মানুষের ভালবাসার মনটাকে যে সত্যই একটা নিঃস্ব মন বলে মনে হয়। এমন মানুষ শুধু মুখের কথা বলে, আর শুধু কথা দিয়ে সুলতাকে রূপকথার মেয়ে বলে তোষামোদ করে সুখী হয়ে যায়।

বোধহয় অনেক আশা করেছিল সুলতা, জয়ন্ত হয় আসবে, নয় একটা চিঠি দেবে। সে চিঠিতে জয়ন্তর রাগ আক্ষেপ আর দুঃসহ বিস্ময়ের কথা থাকবে। সে চিঠি পড়ে খুশিই হতো সুলতা; সে চিঠিতে যদি সুলতাকে ধিক্কার দিয়ে নিদারুণ কয়েকটা ঘৃণার কথাও

থাকতো, তবু সে চিঠি পড়তে ভাল লাগতো। বুঝতে অসুবিধে হতো না, একটা পুরুষের মন ব্যথিত হয়েছে। রায়মাণিকপুরের রাজবাড়ির মেয়ের নির্মমতাকে ক্ষমা করতে পারছে না জয়ন্ত; এমন জয়ন্তকে জীবনে আর চোখে দেখতে না পেলেও, আর কোনদিন একটা ভালবাসার কথা না বলতে পারলেও নিজের মনের কাছে স্বীকার করতো সুলতা, জয়ন্তকে ভালবাসতে পারলে ভুল হতো না।

সুরজিৎ রায় বলেন—আমি ভাবছি…।

সুলতা—কি?

সুরজিৎ রায়—বাসনাকে একটা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিই যে…।

প্রভাময়ী ব্যস্তভাবে ছুটে আসেন—কি? কিসের জন্যে?

সুরজিৎ রায়—জয়ন্ত যেন একবার এখানে আসে।

ক্ষুব্ধস্বরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠে প্রতিবাদ করে সুলতা—না।

চলে যায় সুলতা। সুরজিৎ রায় আশ্চর্য হয়ে প্রভাময়ীর মুখের দিকে তাকান।—তোমার মেয়েকে তো কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

প্রভাময়ী—কি বলছে সুলতা?

সুরজিৎ রায়—কিছুই তো স্পষ্ট করে বলতে পারছে না।

প্রভাময়ী—আমি তো দেখছি; বেশ স্পষ্ট করেই বলে দিয়ে গেল।

সুরজিৎ রায়—কি বললে?

প্রভাময়ী—এই যে, জয়ন্ত যেন এখানে না আসে।

সুরজিৎ—এর মানে কি এই বোঝায় যে, দিব্যেন্দুকেই বিয়ে করতে চায় তোমার মেয়ে?

প্রভাময়ী—তা ছাড়া আর কি?

সুরজিৎ রায়—বেশ, আমার আর কিছু বলার নেই। দিব্যেন্দুর মত একটা…।

প্রভাময়ী—তুমি দিব্যেন্দুর নামে আর ওভাবে কথা বলো না। শত হোক্…।

সুরজিৎ রায়—শত হোক্, কলকাতার বড়লোকের ছেলে; আমি কি করে সন্দেহ না করে থাকতে পারি প্রভা? আমার যে ভাবতে একটুও ভাল লাগে না।

প্রভাময়ী—ছিঃ, তুমি তোমার যত সেকেলে সন্দেহ আর বাজে গর্ব নিয়ে…।

—কি বললে? বাজে গর্ব? তুমিও একথা বললে?

প্রভাময়ী ব্যথিতভাবে, এবং যেন একটু লজ্জিত হয়ে সুরজিৎ রায়ের এই করুণ অহংকারের বিদ্রোহটাকে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করেন।—দিব্যেন্দু তোমাকে শ্রদ্ধা করে না, এমন ধারণা করছো কেন? হোক্ না কলকাতার হালের বড়লোকের ছেলে, কিন্তু তার মনটা তো ভাল হতে পারে।

—অসম্ভব। চেঁচিয়ে ওঠেন সুরজিৎ রায়। আরও হু'চারটে রুষ্ট আপত্তির কথা হয়তো বলতেন; কিন্তু চাকর রামশরণ এসে একটা চিঠি দিয়ে চলে যায়। কলকাতা থেকে এসেছে চিঠি।

কে লিখেছে?

চিঠি খুলেই আশ্চর্য হয়ে প্রভাময়ীর মুখের দিকে তাকান সুরজিৎ রায়।—দিব্যেন্দু চিঠি লিখিছে, প্রভা?

প্রভাময়ীর দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।—দিব্যেন্দু?

—হ্যাঁ।

—কি লিখেছে?

যে-কথা লিখেছে দিব্যেন্দু; সে-কথা সুরজিৎ রায়ের প্রাণের কাছে যেন একটা অদ্ভুত অভাবিত বিস্ময়। চিঠি পড়তে পড়তে লজ্জিত হয়ে সুরজিৎ রায়ের মাথাটা বার বার হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়তে থাকে। দিব্যেন্দু যে সত্যিই জয়বিলাসের নিঃস্ব রাজবাড়ির অদৃষ্টের উদ্দেশে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য পাঠিয়েছে; দিব্যেন্দু সত্যিই যে একটা আশ্বাস, একটা প্রতিজ্ঞা। সত্যিই যে রাজপুতের মনের মত একটা মন নিয়ে দিব্যেন্দুর মন কথা বলেছে।

চিঠির ভাব আর ভাষা, দুই-ই যেন এক অবিচল সংকল্পের মানুষের প্রাণের কলরব। দিব্যেন্দু লিখেছে, আমি এক কথার মানুষ। আমি সুলতাকে যে-কথা দিয়েছি; সে-কথার নড়চড় করে দেবার সাধ্যি ভগবানেরও নেই। আপনার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা আমি জানি না; কিন্তু আপনার মেয়ের অদৃষ্টের ভার আমারই জীবনের দায়; আপনি আপত্তি করলেও আমি শুনবো না। শুধু সুলতাকে নয়; আপনাদের সুখী করবার আর সুখে রাখবার দায়িত্বও আমার। আমার ইচ্ছা, আপনার জয়বিলাসকে আমি কিনে নিয়ে আপনারই কাছে আবার ছেড়ে দেব। আপনাকে আমি কোন দুশ্চিন্তায় ভুগতে দেব না। শিগ্‌গির বর্ধমান যাচ্ছি। জয়বিলাসের নীলাম অ্যাটেণ্ড করে, আর, পারি তো হাইয়েস্ট বিড দিয়ে জয়বিলাসকে কিনে নিয়েই আমি রায়-মাণিকপুর যাব। সুলতাকে একথা জানিয়ে দেবেন। ইতি—।

প্রভাময়ীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ যেন হতভম্বের মত তাকিয়ে থাকেন সুরজিৎ রায়। তার পরেই দুই চোখ জলে ভরে গিয়ে ছলছল করতে থাকে।—এ কী অদ্ভুত কথা লিখেছে দিব্যেন্দু!

প্রভাময়ী—এইবার ভেবে দেখ, কতবড় ভুল ধারণা নিয়ে তুমি দিব্যেন্দুকে মিছে সন্দেহ করেছো?

সুরজিৎ রায়—সত্যিই ভুল হয়েছে প্রভা।

মাথা হেঁট করে, জয়বিলাসের সে-কেলে এক ভয়ানক কুসংস্কারের অহংকার যেন ত্রুটি স্বীকার করছে। সুরজিৎ রায়ের এই হেঁট-মাথা মূর্তিটাকে দেখলে তাই মনে করতে হয়। নবাব আলিবর্দির দুর্ধর্ষ পরগনাইত সংসারচন্দ্র রায়ের বংশধর সুরজিৎ রায়ের অদৃষ্ট আজ একেলে নিয়মের শাসনে নিঃস্ব রিক্ত ও ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে; জয়বিলাসের দুঃখকে দরদ দিয়ে বুঝতে পারবে, এমন মানুষ আর একালের পৃথিবীতে নেই; সুরজিৎ রায়ের এই সন্দেহের ভুল ভেঙ্গে দিয়ে কলকাতার দিব্যেন্দুর ইচ্ছাটা যেন জোর করে এসে জয়বিলাসের মেয়ের হাত ধরতে চাইছে। ঠিকই তো, সেকেলে

রাজপুতের মেজাজ পৃথিবী থেকে এখনও লুপ্ত হয়ে যায়নি। দিব্যেন্দু যে সত্যিই নতুন রাজপুত। জোর করে ভক্তিশ্রদ্ধা করতে আর ভালবাসতে জানে। জোর করে উপকার করতে ভালবাসে। সুরজিৎ রায় যে তাঁর মেয়ের জীবনে এইরকম একটি বান্ধবের আগমন আশা করে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন। দিব্যেন্দু যে সত্যই নিশ্চিন্ত করে দিল।

আজ তিন মাস হলো, শুধু ঋণ করে এই জয়বিলাসের নিত্যদিনের ক্ষুধা-তৃষ্ণার দাবি মিটাতে হয়েছে। কিন্তু ব্যাঙ্ক বলেছে, আর ধার দিতে পারবে না। আর, যুগল সরকারও এসে জানিয়ে দিয়ে গিয়েছে, না, তারক মুদিও আর ধারে জিনিস দিতে রাজি নয়। এক জোড়া ধুতি আর এক জোড়া শাড়ি ধারে দেবার জন্য সুরেন্দ্র বস্ত্রালয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন সুরজিৎ রায়; চাকর রামশরণ সেই চিঠি হাতে নিয়ে ফিরে এসেছে। ধারে কাপড় দিতে সুরেন্দ্র বস্ত্রালয়ও রাজি নয়। রাজবাড়ি জয়বিলাসের অদৃষ্টের উপর যেন এক একটা নির্মম বিদ্রূপ কশাঘাত হেনেছে। এ অপমান সহ্য করতে গিয়ে বৃদ্ধ সুরজিৎ রায়ের চোখ যেন হঠাৎ-পাগল মানুষের চোখের মত ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল।

না, এই জয়বিলাসের আর সাধ্যি নেই; এমন অভিশাপের আঘাত থেকে বেঁচে থাকবার আর সাধ্যি নেই এই জয়বিলাসের। বেঁচে থাকবার অধিকারও নেই। বেঁচে থাকা সাজে না। তাই জয়বিলাসকে অভিশাপের কাছেই নীলামে বিকিয়ে দিয়ে একেবারে শূন্য হয়ে যাবার সংকল্প করে ফেলেছেন সুরজিৎ রায়। জয়বিলাসকে বিক্রি করে দিয়ে এই পৃথিবীর কোন এক নিভৃতে একটা মাটির ঘরে গিয়ে ঠাঁই নিতে হবে। শুধু মনে করে নিতে হবে; স্বামী আর স্ত্রীকে একসঙ্গে সন্ন্যাস ব্রত নিতে হলো। দুঃখ করবার কোন দরকার হবে না। দুঃখ করবার কোন অর্থও হয় না।

কিন্তু···দিব্যেন্দুর এই চিঠি যে মুমূর্ষু জয়বিলাসের কাছে পুনর্জন্মের

প্রতিশ্রুতি। সুরজিৎ রায় বলেন—কথাটা সুলতাকে জানিয়ে দাও প্রভা।

জানিয়ে দিতে দেরিও করেন না প্রভাময়ী। আর, জয়বিলাসের মেয়ে সুলতার দুই চোখ যেন এক নতুন বিস্ময়ের বার্তা শোনার আনন্দে হেসে ওঠে। হাসিটা বিদ্যুতের ঝিলিকের মত হাসি। সুলতার চোখের তারা থেকে যেন একটা আগুনের খুশির ফুল্‌কি ছিটকে পড়তে থাকে। না, আর কোন সন্দেহ নেই, দিব্যেন্দু আসছে। সুলতার অদৃষ্ট সেকেলে এক নিঃস্ব রাজবাড়ির ভাঙ্গা হাতিদুয়ার পার হয়ে একেলে এক রাজবাড়ির ঝলমলে বৈভবের কোলে গিয়ে ঠাঁই নেবে।

গল্পের বইটা হাতের কাছেই ছিল। গল্পটা পড়তে গিয়ে সুলতার প্রাণ যেন নতুন করে হেসে ওঠে। ঠিকই তো, গল্পের এই রাজকুমারী, যার নাম সুকন্যা, তার প্রাণটাও যে খুব সাবধান হয়ে উঠেছে, যেন ভুল না হয়। রাজা শর্যাতির মেয়ে সুকন্যা বুঝতে পারছে না, কার গলায় মালা দেওয়া উচিত। ঋষি চ্যবন? অথবা অশ্বিনীপুত্র রেবন্ত? দুই পুরুষের দুই সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে সুকন্যার চোখ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছটফট করছে। বুঝতে পারছে না সুকন্যা, কে বেশি সুন্দর? কাকে ভালবাসা উচিত? কাকে ভালবাসতে বেশি ভাল লাগবে?

ঋষি চ্যবনের চোখের দৃষ্টিতে কি-ভয়ানক করুণতা! যেন মিনতি করে কিছু বলতে চাইছে চ্যবনের প্রাণ। জোর করতে পারি না, দাবি করবার সাহস নেই; তুমি নারী, তুমি তোমার মায়ার গুণে মহীয়সী হয়ে আমার গলায় তোমার ভালবাসার মালা তুলে দাও।

আর, রেবন্তের চোখে যেন অদ্ভুত দৃপ্ত হাসির দ্যুতি। যেন বলতে চাইছে রেবন্ত, আমার গলায় মালা না দিয়ে তোমার উপায় নেই। আমার মনে কোন সন্দেহ নেই; আমি জানি, তুমি খুশি হয়ে আমারই গলায় তোমার হাতের মালা সঁপে দিতে চাও।

গল্পের বইটাকে বিছানার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই ছটফট করে

উঠে দাঁড়ায় সুলতা। সুলতার প্রাণটা যেন নিজেরই অদৃষ্টের উপর রাগ করে ছটফটিয়ে উঠেছে। এই সুকন্যার মত দুর্ভাগ্য যেন কোন মেয়ের জীবনে দেখা না দেয়। এ যে সত্যিই একটা অভিশাপ, বুঝতেই পারা যাচ্ছে না, কার গলার মালা দেওয়া উচিত।

আনমনার মত অনেকক্ষণ ধরে এঘর আর ওঘরের যত নীরবতার মধ্যে ঘোরাফেরা করলেও মনের ভার একটু হালকা হয় না। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দূরের কাঁকালির চড়ার কাশবনের দিকে তাকালেও মনটা শান্ত হয় না। বুকের ভিতরে কি যেন বিঁধছে। যেন জোর করে বুকের ভিতর থেকে একটা বাজে মায়াকে তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছে সুলতা, কিন্তু সেই মায়াটাই নির্মম হয়ে কাঁটার মত বিঁধছে।

মায়াটা একটা তন্দ্রার ছবি যেন। বাগবাজারের একটা গলির ভিতরে ছোট্ট একটা ঘরের ভিতরে রাজবাড়ি জয়বিলাসের এই মেয়ের সারা শরীরটা যেন দুটো মিষ্টি হাতের আলিঙ্গনের মধ্যে আত্মহারা হয়ে লুটিয়ে পড়ে আছে। রান্নাবান্না সারা হয়ে গেছে, রাতের গঙ্গার ঢেউয়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে; কিন্তু সব চেয়ে ভাল লাগছে, ঐ দুই হাতের বাঁধনের মধ্যে পড়ে থাকতে, আর, তার কানের কাছে মাঝে মাঝে বলে দিতে, এই তো ভাল, এর চেয়ে বেশি সুখ আর চাই না। তোমার এই ঘরেই যে আমার মত মেয়ের অদৃষ্টকে সবচেয়ে ভাল মানায়। এখানে শান্তি আছে, সম্মান আছে।

কিন্তু···ওকি? রামশরণের সঙ্গে এত চেঁচিয়ে কথা বলছে কে?

চমকে ওঠে সুলতা। স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, তাই স্পষ্ট বুঝতেও পারা যাচ্ছে। রামশরণ বলছে—না, তারক মুদী বললে, ধারে এক সের চালও দিতে পারবে না।

প্রভাময়ী—চিঠিতে বলা হলো, বাড়ি বিক্রি হবে; সব টাকা শিগগির শোধ করে দেওয়া হবে। তবুও মুদী বিশ টাকার জিনিস দিলে না?

রামশরণ—না, মা।

প্রভাময়ী—ভাল কথা। তবে আজ আর হেঁসেলে ঢুকে কাজ নেই।

ছুটে আসে সুলতা। যেন একটা আতঙ্কিক অদৃষ্ট মরিয়া হয়ে জীবনের সব অপমানের হিসেব-নিকেশ করতে চাইছে। গলা থেকে সোনার হারটাকে একটানে তুলে নিয়ে চাকর রামশরণের হাতের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দেয় সুলতা।—যাও, এখনই এটাকে বেচে দিয়ে এস। চাল ডাল, যা যা কেনবার আছে, সব কিনে নিয়ে চলে এস।

প্রভাময়ীও একটু আতঙ্কিত হয়ে যেন বাধা দিতে চেষ্টা করেন—ও কি? ওকি করছিস সুলতা?

সুলতা—যা করা উচিত, তাই করছি।

প্রভাময়ী—কিন্তু…।

সুলতা—কিন্তু টিন্তু কিছু নেই। এরকম সোনার হার অনেক পাওয়া যাবে।

প্রভাময়ী—কি বললি?

সুলতা—আর কোন চিঠি এসেছে?

প্রভাময়ী—কার চিঠি।

সুলতা—দিব্যেন্দুর?

প্রভাময়ী—না, আর আসেনি।

সুলতা—তোমরা কোন চিঠি দিয়েছিলে?

প্রভাময়ী—কাকে?

সুলতা—দিব্যেন্দুকে?

প্রভাময়ী—না।

সুলতা—দাওনি কেন?

প্রভাময়ী—অ্যাঁ?

সুলতা—এখনও ভুল করছো কেন?

প্রভাময়ী বিব্রতভাবে বলেন—ঠিকই; দিব্যেন্দুকে একটা চিঠি দেওয়া উচিত ছিল। আজই দেব।

॥ তের ॥

কলকাতার যত পরশুদিনের বড়লোক, কোথা থেকে যে টাকা পায় আর বাড়ি-গাড়ি হাঁকায়, ধরাকে সরা জ্ঞান করে আর ট্যাক্স ফাঁকি দেয়, অথচ দণ্ডমুণ্ডের সরকার ওদের গায়ে একটা চিমটি দিতেও পারে না। পাঁচ আনা পয়সা বাঁচাবার জন্যে মিথ্যে কথা বলে ওরা···

যাদের সম্বন্ধে এতদিন ধরে এই ভাষায় কথা বলেছেন সুরজিৎ রায়, তাদের সম্বন্ধে আজ কথা বলতে গিয়ে যেন একটু ফাঁপরে পড়েছেন। সত্যিই তো, দিব্যেন্দু মিত্রের মত মানুষকেও বুঝতে যেন বেশ একটু ভুল হয়েছে। যা সন্দেহ করা হয়েছিল, তা তো নয় দিব্যেন্দু।

দিব্যেন্দু যে সত্যিই এই পুরনো রাজবাড়ির অক্ষম অসহায় আর রিক্ত অদৃষ্টে একটা আশার প্রতিশ্রুতি।

কিছুদিন আগে কলকাতা থেকে যে চিঠিটা এসেছিল, সেই চিঠি পড়ে একটু আশ্চর্য হয়েছিলেন সুরজিৎ রায়। চিঠিটা সুলতার সেজমামার চিঠি।—এই মাসেরই শেষ দিকে বিলেত যাবে দিব্যেন্দু। আর, সুসংবাদ এই যে, দিব্যেন্দু নিজের মুখে বলে গেল যে, বিলেত যাবার আগে আপনাদের নিশ্চিন্ত করে দিয়ে যাবে।

কি বলতে চায় দিব্যেন্দু? একথার অর্থটা কি? প্রভাময়ীর কাছে বিস্ময় প্রকাশ করে সুরজিৎ রায় বলেছেন—মনে হচ্ছে এই মাসেরই মধ্যে বিয়ের ব্যাপারটা চুকিয়ে দিতে চায় দিব্যেন্দু।

প্রভাময়ী—তাই তো মনে হয়।

সুরজিৎ রায়—বিয়ের পর সুলতাকে সঙ্গে নিয়েই বিলেত যাবে দিব্যেন্দু, এরকম কথাও নাকি ছিল?

—ছিল।

—কলকাতার সেজ-বউ এ চিঠিতে আমাকে কিন্তু বেশ একটু খোঁটা দিয়ে কয়েকটা কথা লিখেছে।

খোঁটা বলে মনে করছ কেন? আমাদেরও তো একটু অভদ্রতা হয়েছে। এ বিয়ের কথাতে আমরা যে কোন গরজ দেখাইনি, এটা তো মিথ্যে নয়। তুমি তো সেজ-বউদিকে একটা খুশির কথাও লিখে জানাওনি।

—ঠিকই, একটু অন্যায়ই হয়েছে।

—সুলতাও এজন্যে বেশ দুঃখিত হয়েছিল।

—হবারই কথা।

জয়বিলাসের বাপ ও মা-র মুখের এই ধরণের শান্ত বার্ত্তালাপের ভাষা সুলতারও কানে পৌঁছেছে। শুনতে পেয়ে হেসে উঠেছে সুলতার চোখ। বাবা আর মা যেন এতদিনে তাঁদের ভুল ধারণার জন্য প্রায়শ্চিত্তের অনুতাপের মত আক্ষেপ করছেন। মেয়ের ভালবাসা আর আশার মধ্যে কি-যে ভুল দেখেছিলেন বাবা আর মা, তা ভগবানই জানেন। দিব্যেন্দুকে এই পুরনো রাজবাড়ির মেয়ের জীবনে একটা সৌভাগ্য বলে মনে করতে কোন্ অহঙ্কারে যে বেধেছিল, তা বোধহয় ভগবানও জানেন না।

সত্যিই যে সব দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত করে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে দিব্যেন্দু। বর্ধমান থেকে টেলিগ্রাম করেছে যুগল সরকার, এক লক্ষ তের হাজার টাকা দিয়ে নীলামের জয়বিলাসকে কলকাতার দিব্যেন্দু মিত্রই কিনে নিয়েছে। মারোয়াড়ীর ডাক যতখানি উঠেছে, তার চেয়ে এক হাজার টাকা বেশি ডেকেছে দিব্যেন্দু মিত্র। সাপ্তাহিক বর্ধমান 'লক্ষ্মী'র সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে—বাংলাদেশের ঐতিহাসিক রাজবাড়ি এই জয়বিলাস যে অবাঙালীর করতলগত হয় নাই, তজ্জন্য আমরা দিব্যেন্দু মিত্রকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আগে হিসেব করেছিলেন সুরজিৎ রায়, খুব সম্ভব এক লক্ষ পাঁচ হাজারে বিক্রি হবে। এর মধ্যে প্রায় একলাখ টাকা দিয়ে ব্যাঙ্কের পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে। ব্যাঙ্ক বলেছে, একবারে এক লাখ টাকা দিলে সুদের আর পাঁচ হাজার টাকা মাপ করে দেওয়া হবে। বাকি

হাতে যা থাকবে, তাই দিয়ে দেওঘরে একটা বাড়ি কিনতে পারা যাবে। যুগল সরকার বলেছে, বাড়িটার দেয়াল মাটির, চালাটা খাপরার, কিন্তু একটা ঘরের মেঝে বেশ পাকা-পোক্ত।

কথা বলতে গিয়ে সেদিন কেঁপে কেঁপে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন সুরজিৎ রায়—ভালই হবে প্রভা, একেবারে খাঁটি সন্ন্যাস নিয়ে সরে পড়া যাবে।

কিন্তু যুগল সরকারের টেলিগ্রামের খবরটা সুরজিৎ রায়ের হিসাবে যেন ভুল করিয়ে দিয়েছে। তবে কি দেওঘরের মাটির বাড়িটা কেনবার দরকার হবে না? দিব্যেন্দু কি এই পুরনো জয়বিলাসকে শ্রদ্ধা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য এই কাণ্ডটা করেছে? তবে কি সত্যিই সেদিন পর্যন্ত, যেদিন চলে যাবার ডাক আসবে, এই জয়-বিলাসের ঠাণ্ডা পাথরের মেজেতে মাতুর পেতে শুয়ে শান্তির ঘুম ঘুমিয়ে নিতে পারা যাবে? মরানদী কাঁকালির শ্রাবণ মাসের বানের চেহারাটা ছ'চোখ ভরে দেখে নিতে পারা যাবে?

প্রভাময়ী বলেন—বুঝতেই তো পারা যাচ্ছে, আমরা যাতে শেষের দিন ক'টা এখানেই পড়ে থাকতে পারি, সেই জন্যেই দিব্যেন্দু বাড়িটাকে কিনেছে।

না, আর একথা প্রভাময়ীর কাছে বলতে পারবেন না সুরজিৎ রায়, একেলে বড়লোকদের ভাবগতিক আমি একটুও বিশ্বাস করি না, পছন্দও করি না প্রভা। ওদের সঙ্গে আমাদের কোনদিন মিল হতে পারে না। ওরা শত্রুপক্ষ।...হ্যাঁ...ঐ যে, চমৎকার দেখতে সেই যে ছেলেটি শেক্সপীয়র কিনতে এসেছিল, ওদের সঙ্গেই মেলামেশা সম্ভব। ওরাই আমাদের মত মানুষের আপনজন হতে পারে। ওদের বিশ্বাস করা যায়। জানি না, তোমার মেয়ে কেন যে...

সেই সুরজিৎ রায়, আজ তাঁর পুরনো ধারণার জন্য যেন একটু লজ্জিত হয়ে, একটু অনুতপ্ত হয়ে, আর বেশ আশ্চর্য হয়ে প্রভাময়ীর কাছে বলতে পারেন—আমাদের আপত্তির ব্যাপার দেখে মেয়েটা সত্যিই মনে মনে খুব দুঃখ পেয়েছে।

জয়বিলাসের বাবা আর মা-র এই নতুন ধারণার যত বিস্ময়ের কথার কিছু কিছু সুলতা শুনতে পায়। বারান্দা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে, কিংবা রেলিং-এর গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দেবদারুর মাথার দিকে তাকিয়ে সুলতার মুখে যে হাসি ফুটে ওঠে, সেটাও একটা নিশ্চিন্ত জীবনের তৃপ্তির হাসি। সব সন্দেহ আর ভয় থেকে মুক্ত হবার হাসি। জয়ন্ত নামে একটা কবিত্বের কয়েকটা ভাল কথার কাছে দুর্বল হয়ে যাবার ভুল থেকে মুক্তি পাওয়ার হাসি। ভালই করেছে সুলতা, কলকাতা থেকে চলে আসবার পরেও বাসনাকে একটা খবরও দেয়নি সুলতা।

শুনতে পায় সুলতা, সুরজিৎ রায় বলছেন—কিন্তু, এটা আমার ভাল লাগছে না প্রভা, দিব্যেন্দু একবারও এখানে এল না।

সুলতা মনে মনে হাসে।—এখনও সন্দেহ ?

চাকর রামশরণকে ডাক দিয়ে কথা বলে সুলতা—কলকাতা থেকে দিব্যেন্দুবাবু বোধহয় আজ কিংবা কাল এখানে আসবেন। নিজের গাড়িতে আসবেন। তুমি ফটকের দিকে একটু নজর রেখ।

রামশরণ কথা দেয়—তা তো রাখতেই হবে দিদিমনি। কাল আরও কত সাহেব আর বাবু আসবেন।

—কেন ?

—কালও যে নীলাম আছে।

॥ চৌদ্দ ॥

নীলামে বিকিয়ে গেল সবই। যত বেলোয়ারী ঝাড়-লণ্ঠন, রুপোর গোলাবপাশ আর আতরদান, চন্দনকাঠের অনেক সম্ভার, শিকারের তাঁবু, হাতির সাজ আর টায়রা, মির্জাপুরী কিংখাবের ফরাস। একগাদা মোরাদাবাদী ডেকচি, যেগুলির প্রত্যেকটিতে একটি আস্ত খাসি রোস্ট করা যায়। সেকেলে গুণীর সেই বীণও বিক্রি হয়ে গেল। বিক্রি হলো না শুধু একটি জিনিস, মরক্কো বাঁধাই এক সেট শেক্সপীয়র। হয় কোন ক্রেতা গরজ করেনি, কিংবা সুরজিৎ রায় নিজেই গরজ করেন নি। তা না হলে, এ জিনিসটাও বোধহয় দশ-পনের টাকায় বিক্রি হয়ে যেত।

নীলামের পাট চুকে যাবার পর যখন ক্রেতার ভিড় চলে যায়, দেবদারুর বাতাস আবার জয়বিলাসের নীরবতার মধ্যে শন্-শন্ করে, তখন হলঘরের শূন্যতার মধ্যে বসে, আর এক হাতে মিছরির শরবতের গেলাস তুলে নিয়ে প্রভাময়ীর সঙ্গে কথা বলেন সুরজিৎ রায়—সত্যিই সেই ছেলেটি বই কিনতে এবারও এল না, প্রভা। আমার কিন্তু আশা হয়েছিল, এবার হয়তো আসবে।

প্রভাময়ী আনমনার মত বলেন—না এলে আর কি করা যাবে ?

সুরজিৎ রায়—একটা ভুলের দুঃখ থেকে যাবে। আমি ঠিক করেছিলাম, ছেলেটি এলে এবার তাকে বইগুলো উপহার দেব।

হাতে রঙীন সিল্কের সুতোর একটা কুণ্ডলী আর দুটো লেসের কাঁটা, সুলতা আজ যেন রঙীন আশার ছবির মত রঙীন সাজে বিচিত্র হয়ে, চোখ দুটোকে অদ্ভুতভাবে দীপ্ত করে নিয়ে, যেন একটা আশীর্বাদ নেবার পিপাসা নিয়ে হলঘরের ভিতরে ঢুকে, সুরজিৎ রায় ও প্রভাময়ীর চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। বেতের মোড়াটাকে কাছে টেনে নিয়ে নীরব আগ্রহের মূর্তির মত বসে পড়ে সুলতা। জয়বিলাসের বাবা

আর মা, তাঁদের মেয়ের মুখের এই প্রসন্নতার দিকে কিছুক্ষণ যেন অপলক চোখে তাকিয়ে থাকেন। দু'জনেরই চোখে যেন একটা মায়াময় মেদুরতা ছলছল করে।

বুঝতে পারা যায়, কি-যেন বলতে চাইছে সুলতা। আর, সুলতাও বলে ফেলতে দেরি করে না।—এসময়ে সেজমামাকে একবার এখানে আসবার জন্যে একটা চিঠি দেওয়া উচিত ছিল।

প্রভাময়ী বলেন,—হ্যাঁ, দেব।

সুরজিৎ রায় হঠাৎ বিচলিতভাবে, যেন বাইরের বারান্দায় একটা চলন্ত ছায়ার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন—কে? কে ওখানে? কে এসেছে, একবার দেখ তো রামশরণ।

রামশরণ ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকে ফিসফিস করে বলে—কলকাতা থেকে দিব্যেন্দুবাবু এসেছেন। কিন্তু গাড়িতে আসেননি।

সুলতার মুখের দিকে তাকিয়ে সুরজিৎ রায় বলেন—দিব্যেন্দুকে এখানেই আসতে বলি?

প্রভাময়ী উত্তর দেন—আসুক না, ভালই তো। সুলতাও এখানে থাকুক।

রামশরণের সঙ্গে হলঘরের ভেতরে ঢুকে আর হেসে হেসে নমস্কার করে যে মূর্তিটা একটা খালি চেয়ারের গা ছুঁয়ে দাঁড়ালো, তার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে সুলতা, আর উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন সুরজিৎ রায়—এস, এস, আমার ধারণা হয়েছিল, তুমি আজ আসবে।

দিব্যেন্দু নয়, জয়ন্ত এসেছে। বোকা রামশরণ ভয়ানক একটা ভুল কথা বলেছে। সুলতার মুখের রঙীন হাসির উপর যেন এক গাদা তপ্ত ধুলোর জ্বালা ছড়িয়ে পড়েছে।

সুলতার দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত হাসে—আমি জানতাম না, বাসনাই আমাকে খবরের কাগজে ছাপা একটা বিজ্ঞাপন দেখিয়ে দিয়ে, আর বলতে গেলে একরকম ধমক দিয়ে আর জোর করে পাঠিয়েছে।

সুলতা—কেন?

জয়ন্ত—বাসনার জেদ, এবার আপনাদের বইগুলো, তার মানে সেই এক সেট শেক্সয়পীর কিনতেই হবে।

সুলতা—কে কিনবে? বাসনা?

জয়ন্ত—না, আমিই যেন কিনি, বাসনার এটা একটা অদ্ভুত জেদ।

প্রভাময়ী বলেন—বাসনার জেদ?

জয়ন্ত—হ্যাঁ, বাসনা আমার ছাত্রী, দিব্যেন্দুবাবুর খুড়তুতো বোন, অ্যাটর্নি যাদববাবুর মেয়ে, আপনাদের মেয়ের সঙ্গে তার খুবই জানা-শোনা আছে। দয়ামাসিমাও বাসনাকে জানেন।

সুরজিৎ রায়—হ্যাঁ, এসব বাসনার চিঠি থেকে আগেই জেনেছি।

জয়ন্ত বলে—তা ছাড়া, আমিও বলেছিলাম, আপনাদের এখানে আবার একবার আসতে আমার খুবই ইচ্ছে আছে।

—নিশ্চয় আসবে। যখন ইচ্ছে হবে তখনই আসবে। তুমি এসে আমাকে নিশ্চিন্ত করেছ জয়ন্তবাবু। সুরজিৎ রায়ের উৎফুল্লতা অদ্ভুত স্বরে বেজে ওঠে।

বোধহয় কিছু বুঝতে পারে না বলেই জয়ন্ত বিড় বিড় করে —কিরকম?

সুরজিৎ রায়—তোমাকে এই বইগুলি উপহার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব।

জয়ন্ত—উপহার? জয়ন্তের চোখে যেন একটা বিস্ময় জ্বলজ্বল করে।

সুরজিৎ রায়—হ্যাঁ।

জয়ন্ত—দিন তবে।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকায় জয়ন্ত—আর আধ ঘণ্টা পরে একটা বাস আছে। সেটা ধরতে পারলে সন্ধ্যার ট্রেনটা ধরতে পারা যাবে।

সুরজিৎ রায় উদাসভাবে বলেন—এখনই যাবে?

জয়ন্ত হাসে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সারা হলঘরের বুকটা যেন হঠাৎ নীরবতার ভারে থমথম করে।

সুরজিৎ রায় আর কোন কথা বলেন না। প্রভাময়ীও নীরব। কিছু বলবার নেই, কিছু বলবার দরকারও নেই, তবু হলঘরের থমথমে নীরবতাও যেন এই সামান্য একটা বিদায় দেবার ঘটনা সহ্য করতে গিয়ে করুণ হয়ে যায়।

সেকেলে রাজবাড়ি জয়বিলাস আজ তার বিকিয়ে-যাওয়া অদৃষ্ট নিয়েও যে-মানুষটাকে ভাল মনে আর খুশি হয়ে উপহার দিল, সে-মানুষটা কিন্তু চেয়ারে না বসে দাঁড়িয়েই আছে। সুরজিৎ রায় না হয় তাঁর উৎফুল্লতার মধ্যে জয়ন্তকে বসতে বলবার কথাটাই ভুলে গিয়েছেন, প্রভাময়ী না হয় কিছুই বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে গিয়েছেন, কিন্তু সুলতা রায় তো একটা সাধারণ সৌজন্যের অনুরোধও করতে পারে। কিন্তু পারে না, সুলতাও যেন জয়ন্ত মাস্টারকে একটা অচেনা আবির্ভাবের মত বিনা সৌজন্যে বিদায় করে দিতে চায়। তা না হলে মাথা হেঁট করে আর এক মনে শুধু লেস বুনতে ব্যস্ত হয়ে উঠবে কেন সুলতা?

কিন্তু মাথা হেঁট করতে গিয়ে সুলতার মুখের সব রঙীনতা যেন ঝরে পড়ে যায়।

বার বার লেসের ঘর ভুল হয়েছে। হাতে কয়েকবার কাঁটার খোঁচাও লেগেছে। না, সুলতা রায়ের প্রাণ এমন অসম্ভবের সঙ্গে আপোস করতে পারবে না। এখনই চলে যাক জয়ন্ত।

কিন্তু জয়ন্ত যেন চলে যাবার ব্যস্ততা হারিয়ে, একটা রূপকথার জগতে আরও কয়েকটা মুহূর্তে দাঁড়িয়ে থাকতে চায়। বইগুলি যে কাছেই একটা টেবিলের উপর সাজানো রয়েছে, তাও বোধহয় এখনও জয়ন্তর চোখে পড়েনি।

সুলতা হঠাৎ যেন ছটফট করে, মনে হয় হাতে-ধরা লেসের কাঁটা দুটোরই উপর রাগ করে, বেতের মোড়ার উপর বসে-থাকা শান্ত চেহারাটাকে যেন এক মুহূর্তের মধ্যে অদ্ভুত রকমের কঠোর করে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। জয়ন্তর মুখের দিকে তাকায়।

সুরজিৎ রায় কি বুঝলেন কে জানে! খুশির স্বরে বলেন—হ্যাঁ, এখন আমাদের জয়ন্তবাবুকে একটু চা খাইয়ে দিতে হয়, সুলতা।

সুরজিৎ রায়ের কথার শব্দ সুলতার কানে পৌঁছেছে বলে মনে হয় না। জয়ন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে সুলতা কি-যেন বলতে চাইছে। বলেই ফেলে সুলতা—আপনি আর এখানে অনর্থক কেন ··ঐ যে আপনার বই।

জয়ন্ত ব্যস্ত হয়ে ওঠে।—হ্যাঁ, দেখতে পেয়েছি।

বইগুলির দিকে এগিয়ে যায় জয়ন্ত। একটা-ছুটো নয়, অনেকগুলো বই।

কাজেই হাতে তুলে নিতে পারা যাবে না। ছ'হাত দিয়ে বইগুলিকে বুকে জড়িয়ে ধরতে হবে।

তাই করুক জয়ন্ত মাস্টার। সুলতার চোখের তারা ছুটো একবার কেঁপে উঠেও সুস্থির হয়ে যায়। যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে, তবে আর বেশি কিছু আশা করবার ছঃসাহস ছেড়ে দিয়ে, জয়বিলাসের এই উপহারকেই যোগ্য পুরস্কার বলে মনে করে আর খুশি হয়ে চলে যাবে জয়ন্ত মাস্টার।

—ও কে? কে ওটা? লোকটা কে রে রামশরণ? সুরজিৎ রায় বাইরের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন। যেন আহত বাঘের একটা ক্ষতের জ্বালা গর্জন করে উঠেছে।

ঠিকই, কেউ বুঝতে পারেনি, কখন এত বড় একটা ঝকঝকে মোটরগাড়ি দেবদারুর কাছে এসে থেমেছে। কত নিঃশব্দে চলে এসেছে গাড়িটা! ট্রাউজার-পরা এক ভদ্রলোক, গলায় রঙীন টাই উড়ছে, চাকর রামশরণের কাছে কি-যেন বলছে। যাই বলুক না কেন, লোকটা জয়মঙ্গলার মন্দিরের সামনে ঐ শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে থাকা কামানটার গায়ে জুতো-পরা একটা পা ঠুকে ঠুকে কথা বলছে কেন?

চমকে ওঠে সুলতা; একঝলক রক্তাভ লজ্জার রঙীন খুশির উৎসব যেন সুলতার সারা মুখে চমকে ওঠে। সুলতা বলে—এসেছে।

কে এসেছে, আর প্রশ্ন করবার দরকার হয় না। শুধু সুলতার

মুখের এই পুলকিত খুশির আভাটা নয়, জয়ন্ত মাস্টারও আচম্‌কা একটা কথা বলে সুরজিৎ রায়ের যন্ত্রণাময় কৌতূহল শান্ত করে দেয়।—দিব্যেন্দু বাবু এসেছেন।

চাকর রামশরণ যেন হাঁপাতে হাঁপাতে আগে-আগে ছুটে আসে, পিছনে দিব্যেন্দু মিত্র। হলঘরের ভিতরে ঢুকেই স্নিগ্ধ স্বরে হেসে ফেলে দিব্যেন্দু—আমি জুলিয়াস সীজর নই সুলতা, আর, সেই সীজারিয়ান অহঙ্কারও আমার নেই; তা না হলে বলতে পারতাম ভেনি ভিডি ভিসি। এলাম দেখলাম আর জিতে নিলাম।

সুলতা হাসে।—তা বলতে পারেন। বললে ভুল বলা হবে না।

দিব্যেন্দুর চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টিটাও বুঝিয়ে দেয়, রিক্ত নিঃস্ব জয়-বিলাসের মেয়ের মুখের এই অভিনন্দনের ভাষার মধ্যে একটুও ভুল নেই। এই জয়বিলাস আজ দিব্যেন্দু মিত্রের কাছে বিকিয়ে যাওয়া একটা সম্পত্তি; জয়বিলাসের এই বাপ আর মা-ও যে আজ দিব্যেন্দু মিত্রের উদার করুণার আশ্রিত দুই প্রজা। আর জয়বিলাসের এই মেয়েও যে দিব্যেন্দু মিত্রের ভালবাসার প্রতিশ্রুতির কাছে নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া একটা সুখী জীবন।

এইবার বৃদ্ধ সুরজিৎ রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আর হেসে হেসে কথা বলে দিব্যেন্দু—কিন্তু ঐ বুড়ো-হাবড়া মরচে-পড়া কামানটাকে ফেলে রেখেছেন কেন? বিক্রি হলো না যখন, তখন জাদুঘরে পাঠিয়ে দিলেই পারতেন।

কি আশ্চর্য, সুরজিৎ রায়ের চোখ দুটো ধিকি ধিকি করে জ্বলতে শুরু করছে। যেন দুটো নিবু-নিবু দীপের শেষ শিখা জ্বলছে। তেল নেই, শুধু দুটো শুকনো সলতে পুড়ছে। আলিবর্দির দুর্ধর্ষ পরগণাইত সংসারচন্দ্র রায়ের যে দুই চোখ কাঁকালির চড়াতে বর্গীর দলকে দেখতে পেয়ে জ্বলে উঠেছিল, সেই চোখ দুটোই যেন অসহ অভিমানের জ্বালায় পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

দিব্যেন্দু বলে—আপনাদের এই বাড়িটাও যেন একটা ভাঙাচোরা

জাদুঘর। তবু শুধু আপনাদের নিশ্চিন্ত করে দেবার জন্যই এক লক্ষ তের হাজার টাকা দিয়ে কিনলাম। আপনারা বুড়ো বয়সে নিরাশ্রয় হবেন না। তাছাড়া অভাবের কথা ভেবে আপনাদের উদ্বিগ্নও হতে হবে না। আমি যখন আপনাদের ভার নেব বলে ঠিক করেছি, তখন জানবেন বেশ ভাল করেই নেব।

সুরজিৎ রায়ের ধবধবে সাদা মূর্তিটার গায়ে আগুনের ছোঁয়া লেগেছে; তা না হলে বুড়ো মানুষের শান্ত মুখটা এত লালচে হয়ে উঠবে কেন? যেন দম বন্ধ করে একটা চিৎকারকে সামলে নিয়ে কথা বলেন সুরজিৎ রায়—তোমার কথায় উদ্বিগ্ন না হলেও একটু লজ্জা পেতে হচ্ছে দিব্যেন্দুবাবু।

দিব্যেন্দু যেন আশ্চর্য হয়!—লজ্জা? নিতান্ত অসার লজ্জা। ওসব কথা ছেড়ে দিন।

হঠাৎ জয়ন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটা ভ্রুভঙ্গী করে দিব্যেন্দু—এই লোকটিকে আমি কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।··আপনি বোধহয় পাগলী টুনির···তার মানে আমাদের বাসনার মাস্টার?

জয়ন্ত শুধু মাথা নেড়ে জবাব দেয়—হ্যাঁ। কিন্তু নীরবে মাথা নেড়ে জবাব দিতে গিয়ে জয়ন্ত মাস্টারের চোখে যেন একটা শাণিত ছুরির আভা চমকে উঠেছে।

ডাকপিয়ন এসেছিল বোধহয়। তাই চাকর রামশরণ একটা চিঠি নিয়ে এসে সুলতার হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে চলে যায়।

জয়ন্ত বোধহয় এখনি চলে যাবে। বইগুলিকে একসঙ্গে জড়ো করে দড়ি দিয়ে বাঁধছে জয়ন্ত! সুরজিৎ রায় যেন একটা করুণ অনুরোধের সুরে চেঁচিয়ে ওঠেন—তুমি এখনি চলে যেও না জয়ন্তবাবু।

দিব্যেন্দু বলে—না, কোন দরকার নেই। ওকে চলে যেতে দিন।

জয়ন্তেরই দিকে তাকিয়ে আদেশ করে দিব্যেন্দু—আপনি এখন যান।

কিন্তু সুলতা যেন একটা করুণ আর্তনাদ চাপতে গিয়ে ফুঁপিয়ে উঠেছে—এ কি? এর মানে কি? এসব কি-রকমের কথা লিখছেন সেজমামী?

জয়বিলাসের বাপ-মার মুখের দিকে তাকিয়ে নয়, দিব্যেন্দু কিংবা জয়ন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে নয়, সুলতা যেন অদৃষ্টের একটা প্রচণ্ড পরিহাসের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে। সেজমামীর চিঠিটা সুলতার হাতের মুঠোর ভিতরেও কাঁপছে।

—কার সঙ্গে কথা বলছো সুলতা? দিব্যেন্দুর প্রশ্নটাও যেন স্নিগ্ধস্বরে হাসে। সুলতা যেন মুমূর্ষু মানুষের ভাষার মত স্বরে বিড় বিড় করে—আপনি এ সপ্তাহেই বিলেত যাবেন?

দিব্যেন্দু—হ্যাঁ।

সুলতা—আইভি সরকারও আপনার সঙ্গে যাবে?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—আমাদের অদৃষ্ট জানে।

—আপনাদের বিয়ে হবে লণ্ডনে?

—হতে পারে। না-ও হতে পারে।

—তাহলে এখানে এসেছেন কেন?

—এসেছি তোমাদের নিশ্চিন্ত করে দিতে। আমি প্রতি মাসে তোমাদের জন্য টাকা পাঠাবো। শ'তিনেক টাকা। যদি চাও তো পাঁচশো পাঠাতে পারি।

—কেন পাঠাবেন?

—তুমি তো শুনেছ, বছরে ছ'মাস আমাকে লণ্ডনে থাকতে হবে। বাকি ছ'মাস কলকাতায়। সেই ছ'মাসের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটি দিন তো তোমাদের এখানে এসে থেকে যেতে পারবো।

—কি বললেন? সুলতা রায়ের মূর্তিটা যেন একটা ভয়াল অভিশাপের বজ্রনাদ শুনে থর থর করে কাঁপছে। একেলে কলকাতার

বড়লোক দিব্যেন্দু মিত্রের উদার প্রতিশ্রুতিটা জহ্লাদের ভাষায় কথা বলছে। তবু ধিক্কার দিয়ে চেঁচিয়ে উঠতে পারছে না সুলতা রায়। সেই দুর্ধর্ষ সংসারচন্দ্র রায়ের বংশধরের মেয়ে সুলতা রায়ের প্রাণে বিদ্রোহের শক্তি নেই।

মনে হয়, প্রভাময়ী বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে, শুধু কতগুলি ধুকপুক নিঃশ্বাসের জোরে কোনমতে চেয়ারের উপর বসে আছেন।

আর, সুরজিৎ রায় যেন একটা প্রাণহীন জীর্ণ পাথরের মূর্তি। অন্ধকারে ভরা একটা প্রকাণ্ড জব্দঘরের মধ্যে অসহায়ের মত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে রায়মানিকপুরের রাজাবাবুর অহংকারের আত্মা। কী চমৎকার একটা স্নিগ্ধস্বরের বিদ্রূপ এসে দাবি করেছে, সেকেলে রাজবাড়ি জয়বিলাস এবার একেলে বড়লোকের ছ'মাসের ফূর্তির বাগানবাড়ি হয়ে যাক।

—সুলতা! চেঁচিয়ে ওঠেন সুরজিৎ রায়—তুই কিছু বলছিস না কেন, জবাব দিতে পারছিস না কেন সুলতা?

কি আশ্চর্য, সুলতা যে সত্যিই দিব্যেন্দু মিত্রের ইচ্ছার কাছে বিকিয়ে যাওয়া একটা মূর্খ দুর্বল অসহায় লোভের মত দাঁড়িয়ে আছে। একটা চিতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সুলতা, তবু যেন চিতার আগুনের জ্বালাটুকুও বুঝতে পারছে না।

দিব্যেন্দু তার স্নিগ্ধস্বরের হাসিরই একটা উচ্ছ্বাস সামলে নিয়ে বলে—না, এখানে নয়, সুলতা একবার ওঘরে চলুক। আরও কয়েকটা কথা বলতে চাই, যে-কথা এখানে সবার সামনে···।

লজ্জিতভাবে হাসতে থাকে দিব্যেন্দু।

হাসিটা যেন একালের একটা প্রচণ্ড উল্লাসের হাসি। পুরনো জয়বিলাসের দুঃখী ও দুর্বল যত আশা ইচ্ছা আর লোভের শেষ বিচার করে যেন রায় শুনিয়ে দিয়েছে হাসিমুখে একালের হাকিম।

রাজবাড়ি জয়বিলাসের মেয়েকে বাগানবাড়ির মেয়ে করে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য একালের টাকাওয়ালার অহংকার কী অদ্ভুত করুণার হাসি

হাসছে। সুরজিৎ রায়ের চোখে আর আগুণ জ্বলে উঠতে পারছে না। সে চোখ থেকে যেন ভস্ম ঝরে পড়ছে। সংসারচন্দ্র রায়ের তরবারির ঝিলিক চিরকালের মত মরে গিয়েছে। এই সুরজিৎ রায়ের চোখের দৃষ্টিতে সে রাগের আগুন আর জ্বলে উঠতে পারে না, যে রাগ একদিন এই রায় মানিকপুরের যুবতী মেয়ের পিছু ধাওয়া লম্পট বর্গীকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে পেরেছিল। সুরজিৎ রায় আজ একটা স্তব্ধ আর্তনাদ মাত্র; একটা ভীরু অসহায় অক্ষম ও অসার বিদ্রোহ মাত্র।

চোখ বন্ধ করে কি ভাবছেন প্রভাময়ী? কিছু বোঝা যায় না। দেখে মনে হয়; একটা মৃত মানুষের মুখ। দিব্যেন্দুর ঐ হাসিকে চোখে দেখবার দুর্ভাগ্যটাকে চোখ বন্ধ করে সহ্য করতে গিয়ে যেন মরেই গিয়েছেন প্রভাময়ী। মেয়েকে জহরব্রতের গল্প শোনাতে গিয়ে একদিন এই প্রভাময়ীর চোখেও যে আগুনের হাসির মত জ্বল-জ্বলে হাসি ফুটে উঠেছিল; কতদিন আগের ঘটনা? বেশিদিন নয়, এই তো, বড় জোর বিশ বছর হবে। ছোট্ট সুলতা সেদিন বেনী দুলিয়ে আর বুড়ো রোশনলালের পিঠে চড়ে এই রাজবাড়ির আমবাগানের আশে-পাশে ছুটোছুটি করেছে। সুরজিৎ রায় সেদিন হেসে-হেসে বলেছিলেন—যে ছেলে ঘোড়া ছুটিয়ে আমার এই সুলতাকে ধরতে পারবে, তার সঙ্গে সুলতার বিয়ে দেব। সেই সুলতাকে আজ কলকাতার এক···।

আর সুলতা? সুলতার মূর্তিটা একবার কেঁপে উঠেই এত শান্ত হয়ে গেল কেন? প্রতিবাদ করবার কি কোন শক্তি নেই সুলতার? ইচ্ছেও নেই কি? দিব্যেন্দুর ইচ্ছার ভাষাটাকে একটা অভিশাপের ভাষা বলে মনে করবারও কি শক্তি নেই এই মেয়ের? কিংবা দিব্যেন্দুর ঐশ্বর্যের ঝংকার শুনতে গিয়ে সত্যিই কি বধির হয়ে গিয়েছে সুলতা?

শুকনো খটখটে চোখ। সুলতার সে চোখে চোখে যেন কোন লজ্জা নেই, এক ছিটে অহংকারের জ্বালাও নেই। এই মেয়ে যে জোর করে নিজের সেই স্বপ্নটাকে আগেই পিষে মেরে দিয়েছে, যে স্বপ্ন

কথা সম্মানের কথা আর কবিত্বের কথা শুনে সে মুগ্ধ হয়েছিল। সম্মানের কথার আর কবিত্বের কথার ধার ধারে না, জোর করে কাছে এগিয়ে আসতে পারে যে মানুষ, সেই মানুষই আজ সুলতার কাছে এগিয়ে এসেছে। উপকার করতে চাইছে, আড়ালে ডেকে নিয়ে কথা বলতে আর, নিশ্চয় হাত ধরতেও চাইছে।

কি আশ্চর্য, সুলতার এই শুকনো খটখটে চোখ দুটো জয়ন্তেরই মুখের দিকে যেন জ্বলন্ত ঘৃণার একটা দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে আবার মেজের উপর হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়ে। বাসনার মাস্টার এই জয়ন্ত যেন একটা অভিশাপ, একটা ঠাট্টা, একটা কাপুরুষ কৌতুক; জয়বিলাসের মেয়ের ভাগ্যের পরিহাস দেখবার জন্য চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। না, উপায় নেই। রিক্ত জয়বিলাসের মেয়েকে এই অপমান থেকে রক্ষা করবার জন্য কারও মনে এক ছিটে ইচ্ছার আগুন জ্বলে উঠবে না। ঠিকই আক্ষেপ করেছিলেন জয়বিলাসের সুরজিৎ রায়, সে রাজপুতের প্রাণ আজ এই পৃথিবীর কোন পুরুষের বুকের মধ্যে বেঁচে নেই। কেউ ছুটে এসে জোর করে ভালবাসার মেয়ের হাত ধরতে জানে না, পারে না। জয়ন্ত মাস্টার একালের এক ভীরুতার ভদ্রলোক মাত্র।

কিন্তু সুলতার এই ভর্ৎসনার চোখ দুটো হঠাৎ ঝাপ্সা হয়ে যায়। এই তো, এখনি যে জয়ন্তকে নিতান্ত অবান্তর একটা আবর্জনা মনে করে এই মুহূর্তে চলে যাবার জন্য তাড়া দিয়েছিল সুলতা, তার উপরে আবার এমন অভিমান কেন? তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার কি অধিকার আছে সুলতার? চোখ দুটো-ঝাপ্সা হয়ে গেলেও ভুলটা ধুয়ে মুছে যাবে না।

তবে তাই ভাল। সকলেই যখন নীরব; সকলেই যখন ভীরু অক্ষম আর অসহায়; তখন আর কার কাছে আবেদন করবে সুলতা? জয়বিলাসের দেবদারুর বাতাসটাও যেন ভীরু হয়ে গিয়েছে, ঝড় হয়ে উঠতে পারছে না। দিব্যেন্দু হাসছে।

হাতের লেস আর কাঁটা মেজের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আস্তে

একটা হাঁপ ছাড়ে সুলতা। তার পরেই শাড়ির লুটিয়ে পড়া আঁচলটাকে হাতে তুলে নিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। সত্যিই ঘর থেকে বের হয়ে আর আড়ালে গিয়ে দিব্যেন্দু মিত্রের কথা শোনবার জন্য ছটফট করে উঠেছে সুলতা। যেন আত্মহত্যা করবার একটা প্রতিজ্ঞায় ছটফট করে উঠেছে।

দিব্যেন্দু ডাকে—এস সুলতা।

—না। কে যেন ভয়ানক গম্ভীর স্বরে বাধা দিয়ে কথা বলে ফেলেছে। সেই গম্ভীর স্বরের ছোট্ট একটা প্রতিধ্বনিও যেন জয়বিলাসের হলঘরের বাতাসে গম্ভীর আক্রোশের মত গড়াতে থাকে। কথা বলে বাধা দিয়েছে জয়ন্ত মাস্টার।

যেন দুঃস্বপ্ন-ভাঙানো একটা বজ্রনাদ শুনতে পেয়েছেন সুরজিৎ রায়। আশ্চর্য হয়ে জয়ন্তর মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকেন। প্রভাময়ীও চোখ মেলে তাকান, যেন চোখের সামনের এতক্ষণের একটা বীভৎস অপমানের অন্ধকারময় আবরণটা হঠাৎ ছিঁড়ে গিয়েছে।

—হোয়াট্! ঠোঁটে দাঁত চেপে যেন একটা হুংকার চাপে দিব্যেন্দু মিত্র।

—আপনি এখনই চলে যান। জবাব দেয় জয়ন্ত।

—আমার কেনা বাড়ি থেকে আমাকেই চলে যাবার জন্য ধমক হাঁকছো, ইউ লিট্‌ল্ ক্রিচার! বাঁ হাতে একটা ঘৃণাভরা তুচ্ছতার ঘুসি তুলে, আর হুইস্কির গন্ধে উত্তপ্ত একটা রাগী নিঃশ্বাসের জ্বালা নিয়ে জয়ন্তর দিকে এগিয়ে যায় দিব্যেন্দু মিত্র।

—খুন হয়ে যাবে দিব্যেন্দু মিত্র, সাবধান! জয়ন্ত মাস্টারের গলার স্বর গর্‌গর্ করে।

—হোয়াট্! আবার চীৎকার করেই থমকে দাঁড়ায় দিব্যেন্দু মিত্র।

দিব্যেন্দু মিত্রের স্তব্ধ ছায়াটাকে শিউরে দিয়ে, যেন দুরন্ত একটা

ঝড়ের আবেগের মূর্তির মত দুরন্ত হয়ে; নীরব হলঘরের বাতাস উতলা করে দিয়ে সুলতার দিকে ছুটে আসে জয়ন্ত। আর, শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ডাক দেয়—সুলতা!

সুলতা হেঁট-মাথা হয়ে আর মুখ লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জয়ন্তর চোখ দুটো যেন জ্বলজলে পিপাসা নিয়ে সুলতার মুখটাকেই খুঁজছে। দেখতে রূপকথার রাজকন্যার মুখের মত মনে হয় যে-মেয়ের মুখ, সে-মেয়ে কি সত্যিই দিব্যেন্দু মিত্রের সাধের বাগানবাড়ির ইচ্ছার কাছেই মরে যেতে চাইছে? তাই যদি হয়, তবে জয়ন্তেরই বা দেরি করবার দরকার কি? জয়ন্ত মাস্টারের মাথার ভিতরে যেন একটা পাগল প্রতিজ্ঞার রক্ত টগবগ করে ফুটে কথা বলছে, তাহলে তুমিই এই মুহূর্তে ঐ মেয়ের নরম গলাটাকে দু'হাতে টিপে ধরে আর দম বন্ধ করে ওর জীবনের সব ভীরুতার ফুসফুসটাকে ফাটিয়ে দিয়ে চলে যাও। এই মেয়েকে একটা সম্মানের মরণ উপহার দিয়ে যাও।

—সুলতা! আবার চাপা গর্জনের স্বরে আস্তে একটা ডাক দিয়ে সুলতার একটা হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে জয়ন্ত।

—বিশ্বাস কর, সুলতা, একটুও মিথ্যে কথা বলছি না। তোমাকে এই মুহূর্তে অনায়াসে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারবো কিন্তু ঐ লোকটার কাছে যেতে দেব না।

চমকে ওঠে সুলতা; যেন দুরন্ত এক বিস্ময়ের অগ্নিশিখা চমকে উঠেছে। সুলতা রায় যেন সামান্য একটা চক্ষুলজ্জার শাসনও ভুলে গিয়ে একেবারে জয়ন্তর গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। যেন জীবনের এক পরম সম্মান আর চরম নিশ্চিন্ততার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় সুলতার প্রাণ। এক হাতে বার বার চোখ মুছতে থাকলেও সুলতার চোখের অদ্ভুত হাসিটা মুছে যায় না।

সুরজিৎ রায়ের চোখ দুটো বিহ্বল হয়ে যেন এক রাজপুতের মেয়ের জীবনের সেই বিস্ময়ের ছবিটাকেই দেখছে। ভালবাসা যেন বরবেশ ধরে আর তরোয়াল চালিয়ে ছুটে এসে ভীরু মেয়ের হাত

চেপে ধরেছে। আর, এক মুহূর্তের মধ্যেই রাজপুতের মেয়ের সেই ভীরু চোখে খুশির হাসি উথলে উঠেছে। কলকাতার জয়ন্ত কি তাহলে একেলে এক রাজপুত? ভালবাসার মেয়েকে জোর করে আপন করে নিল?

—তাই যে মনে হয়। আমার যে তাই মনে হচ্ছে, প্রভা। প্রভাময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করেন সুরজিৎ রায়।

সুরজিৎ রায়ের কথার অর্থ কিছু বুঝতে পারেন না প্রভাময়ী। কিন্তু তাঁরও চোখ দুটো মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকে, জয়ন্তর পাশে সুলতা, সত্যিই তো, এক রাজপুত্রের পাশে এক রাজকন্যা। চোখের জল মুছে নিয়ে, আবার তাকালেও তাই মনে হয়।

দিব্যেন্দু বলে—আপনারা এই মুহূর্তে…

জয়ন্ত বলে—চল সুলতা, তোমাকে এই মুহূর্তে, এখনই আমার সঙ্গে কলকাতা যেতে হবে।

সুরজিৎ রায় বলেন—আমরাও যে যাব, জয়ন্ত।

জয়ন্ত বলে—চলুন।